সামাজিক সমস্যা।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীঅন্নদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।
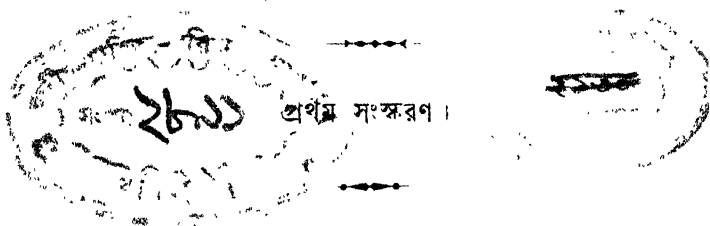
কলিকাতা ;—৬১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,

"বণিক যন্ত্রে"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ আইচ দ্বারা মুদ্রিত

এবং

২২ নং হেরিসন রোড হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ফাল্গুন, ১৩১৭ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।
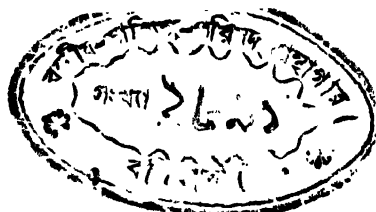
সামাজিক সমস্যা ।

(কোনও ব্রাহ্মণ সভা উপলক্ষে লিখিত ও আংশিক পঠিত)

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সূচনা ।

"দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ," কথাটী গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত। শিক্ষিত সমাজে এই প্রকার অশুদ্ধ প্রয়োগ সঙ্গত নহে। কিন্তু আমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। আমার বিদ্যা-বুদ্ধি নিতান্ত অল্প; যেরূপ শক্তি-সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারেই মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি; বিজ্ঞমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। ভাষার পারিপাট্য, যোজনার সুকৌশল, রচনার মাধুর্য্য, ভাবের বিশুদ্ধতা প্রভৃতি কোন গুণই এই মূর্খ হইতে সম্ভবে না। তবে লিখি কেন, তবে বলি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতেও আমি অক্ষম; আমি নিজেই বুঝি না, কেন লিখি; পরকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা। বিজ্ঞমণ্ডলীর নিকট আমার নিবেদন তাঁহারা যেন আমার দোষগুলি ক্ষমা করেন। আমি জানি,—

"বায়ু যথা কুসুমের গন্ধমাত্র লয়,
ভাষা হ'তে ভক্তি লন, বিভু দয়াময়"।

ভক্তিই দেবতার গ্রাহ্য—দেবতা ভক্তিই চান্। আমার মান্য জনগণকে আমিও, তাই, ভক্তি দিতে ইচ্ছুক। ভাবভক্তি থাকিলে তদগ্রহণে কৃতার্থ করুন।

আমার প্রথমোক্ত গ্রাম্য কথাটী একবারে ভক্তিবিহীন নহে ; উহাতে কিঞ্চিৎ ভাবও আছে। যে কার্য্যে সমবায় শক্তির আবশ্যক সেখানে বহুজনের সহানুভূতি চাই ; নতুবা সে কার্য্যে সাফল্য লাভ দুরাশা মাত্র। পক্ষান্তরে সমবায় শক্তি দ্বারা যে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না এ কথা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যে সকল কাজের কথা উদ্ভূত হয় তাহা যে সমবায় শক্তি দ্বারা বাস্তবিকই সাধনীয়, চতুর্দ্দিগের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দশ জনে একত্র হইয়া একটা কাজ করিলে, দৈব দুর্ব্বিপাকে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেও লজ্জার কথা নাই। চেষ্টা করিয়া দেখা গেল "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ"। আর ভগবদিচ্ছায় যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে "বেশ বাহাদুরী" অপার আনন্দ, বিমল সুখ। আনন্দময় ভগবান যত্নশীল ব্যক্তিকে কখনও নিরানন্দ করেন না। কৃপাময় কৃপাকণা বিতরণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।

বহুদিন হইতে আমরা একটা গুরুতর অভাব অনুভব করিতেছিলাম ; সেই অভাব দূরীকরণার্থ অনেকের আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত সে সুযোগ ঘটে নাই। ভগবদিচ্ছায় আজ সে সুযোগ উপস্থিত। এ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে বোধহয় কেহই ইচ্ছুক নহেন। সকলেই উৎসাহিত, সকলেই যত্নশীল। একই বাসনা প্রণোদিত ব্যক্তিগণ মধ্যে কোনও প্রকার মতানৈক্য ঘটাও সম্ভব নহে। তাই অনায়াসে আমাদের একতা সংঘটন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্রাহ্মণ সমাজে একতা নাই, এক পরামর্শ হইয়া কোন কাজ করিবার শক্তি নাই। একতা না থাকার দরুণ সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে তাহা সকলেই লক্ষ করিতেছেন। একতার যে কি গুণ তাহাও

অনেকেই জানেন। তাই আজি সকলে একতার অভাব দূর করিয়া মিলন প্রয়াসী হইয়াছেন। তাই আজ ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন। এ প্রকার অধিবেশন, বোধ হয় এই প্রথম। আজ শুভদিন বটে। একতা কথার কথা নহে। ইহা এক মহাযজ্ঞ—স্বয়ং ভগবান ইহার আরাধ্যদেব. তদ্গতচিত্তে ভগবচ্চিন্তাই ইহার মূল মন্ত্র; সর্ব্বকার্য্যেই ইহার বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত স্বার্থই ইহার বলী; ঐকান্তিকতা, চিত্তশুদ্ধি, নিরপেক্ষতা, অদ্বৈত ভাব ইহার পূজোপকরণ, জীবন উৎসর্গ ইহার দক্ষিণা, ফল কার্য্যসিদ্ধি। এ যজ্ঞে কাহার না ইচ্ছা হয়? এ মহাযজ্ঞের উদ্যোগ, আয়োজন, অনুষ্ঠান চতুর্দ্দিগেই হইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইল ব্রাহ্মণ সমাজে সে উদ্যোগ চেষ্টা দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য। জ্ঞানে বিজ্ঞানে ব্রাহ্মণজাতি এক সময়ে জগতে শিক্ষকতা করিতেন। কালের কুটিল গতিতে, জাতীয় অবনতির ঘোর ঘুর্ণিপাকে পতিত হইয়া ইঁহারা এখন সে গৌরব হারাইতেছে, শিক্ষক এখন ছাত্রত্ব গ্রহণ করিতেও অক্ষম। একথা ভাবিতেও যে মর্ম্ম বিদীর্ণ হয়। যখন সমস্ত জগৎ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত ছিল, যখন সভ্যতা শব্দটাও জগতের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল; তখনও ভারতীয় বিদ্যা, ভারতীয় জ্ঞান, ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য, ভারতীয় বিজ্ঞান, ভারতীয় দর্শন, ভারতের চিন্তা, ভারতের ভাব, ভারতের নাম ভারতের কাম উন্নতির চরম সীমায় অধিরোহন করিয়াছিল। ভারতীয় মুনিঋষিগণ যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন অদ্য পর্য্যন্ত জগৎ তাহা করিতে পারে নাই। ধ্যানগম্য তত্ত্ব আবিষ্কার করা দূরে থাকুক অনেক জাতি ঐ সকল বিষয় এখন পর্য্যন্ত কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। তাহাদের মস্তিষ্কে এখনও এত শক্তি সঞ্চিত হয় নাই যে তাহারা তদ্বিষয়ক আলোচনা করে। ভারত তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়া, ভারতীয় জ্যোতিষ

কিঞ্চিন্মাত্র বিভাস দেখিয়া অপরাপর জাতি এখন জগৎকে আত্ম গরিমা দেখাইতেছে; রূপান্তরিত বা নামান্তরিত করিয়া ভারতীয় জ্ঞানের অনুধাবনে জাতীয় উন্নতির ধ্বজা উড়াইতেছে। আর আমরা উদ্গত-নেত্রে তাহাদের কার্য্যের অলৌকিকত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যে সকল ধনরত্ন সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, আমরা অবিবেচনা পূর্ব্বক সে গুলিকে সারহীন মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি। বিনা বিচারে আমরা সিদ্ধান্ত করি আমাদের কিছু ছিল না, আমাদের কিছু নাই! চতুর্দ্দিগে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই বিদেশীয় আমদানী। কল-কারখানা যন্ত্রাদি সম্বন্ধেও আমাদের এই প্রকার অমূলক মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কল-কারখানা কি ভারতের লোক জানিত না? মেঘনাদ মেঘান্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন একথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি; কারণ ইহা অসম্ভব ঘটনা। কিন্তু ইউরোপে বাষ্পীয় পোত নির্ম্মিত হইতেছে, শূণ্যে উড্ডীন হইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, একথা আমরা বিনা আপত্তিতে সত্য বলিয়া স্বীকার করি, কারণ ইহা সম্ভব। লক্ষণ চতুদ্দশ বৎসর অনিদ্রায় ছিলেন একথা আমরা অতিরঞ্জিত মনে করি; কিন্তু কালীফর্ণিয়া দ্বীপের জনৈক শ্বেতাঙ্গ বহুকাল পর্য্যন্ত ওরূপ অনিদ্রাবস্থায় আছে. একথা আমাদের গ্রাহ্য। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বরে যমুনা উজান বহিত একথা মিথ্যা, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে যখন তাদৃশ কৌশল আবিষ্কৃত হইল তখন আমরা তাহা অনায়াসে স্বীকার করিলাম। হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত চতুর্দ্দশ ভূমণ্ডল মিথ্যা কথা কিন্তু এখন যে মেরু আবিষ্কারের ধুম পড়িয়া গিয়াছে ইহাতেই আমরা আশ্বস্ত। প্রস্তরাদিতে জীবনী শক্তি আছে, ভারতবাসী যখন ইহা সিদ্ধান্ত করিল তখন আমরা ইহা বিশ্বাস করিলাম না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন

উহা সত্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন তখন আমরা সুবোধ বালকের ন্যায় তাহাদের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলাম। আমাদের গঙ্গার জল পবিত্র নহে। কিন্তু ডাক্তারগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিলেন গঙ্গাজলে অনেক খনিজ পদার্থ আছে; রোগ বিশেষে ডাক্তার যখন গঙ্গাস্নানের ব্যবস্থা দিলেন তখন আমাদের গঙ্গাভক্তি উথলিয়া উঠিল। হিন্দুর আধ্যাত্মিক জগৎ মিথ্যা কথা; কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সার সাহেব যখন জড় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিলেন তখন আমরা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম, আশা ছিল স্পেন্সার সাহেব আমাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বটা বুঝাইবেন। কিন্তু আমাদের সে সাধ মিটিল না। বিজ্ঞান গুরু স্পষ্টতঃ বলিয়া ফেলিলেন "আমি যাহা লিখিলাম তাহা হইতে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্ভেদ হইল না, অধিকন্তু উহাকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া ফেলিলাম"। (১) হিন্দুর বেদবেদান্ত কোন কাজের বহি নহে, ও সব গল্প কথার ছড়াছড়ি। কিন্তু স্কোপেনহার বলিলেন "উপনিষদের তুল্য মহোপকারী গ্রন্থ জগতে আর নাই; উহা আমার জীবনের শান্তি মৃত্যুকালেও উহা আমার শান্তিদায়ক হইবে" (২)। আবার দেখুন কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক ডাক্তার পল ডিউসন বলিয়াছেন "পবিত্র নৈতিক জীবন গঠনার্থ বেদান্ত অভ্রান্ত সত্য, জীবন মৃত্যুর দুঃখ কষ্টে ইহা নিতান্ত শান্তিপ্রদ; হিন্দুগণ এই ধর্ম্মে আস্থাবান" (৩)।

---

(১) Indeed so far from making the universe a less mystery than before, it makes it a great mystery.

(২) In the whole world there is no study so benificial and elevating as that of the upanishads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.

(৩) So the Vedant, in its unfalsified form, is the strongest support of pure moraltiy, is the strougest consolation in the sufferings of life and death.

হিন্দু ঋষিগণ ভগবানের ত্রিগুণকে ত্রিধা আরাধনা করিতেন। আমরা কিন্তু তাহাতে নারাজ হইলাম। আমরা স্থির করিলাম ভগবানের ত্রিগুণকে আরাধনা করিলে বহূপাসক হইতে হয়, সে যে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিরুদ্ধ, শাস্ত্রে আছে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। কিন্তু কি বিপদ! সিক্রেট ডক্‌ট্রিন বলিতেছেন "পরম ব্রহ্ম অনন্ত সুতরাং তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তিনি প্রকাশ শীল সুতরাং তিনি ত্রিমূর্ত্তি"। (১)। যেই এই কথা শুনিলাম অমনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে পূজা করিতে বসিলাম। হিন্দুদের নিয়ম আছে এক জনের নামে অন্য এক জনে পূজা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু বিদেশী পুরোহিতগণ তথা অস্মদ্দেশী তচ্ছাত্রগণ বলিলেন ইহা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অর্থাৎ হিন্দুরা যে সংকল্প করে ওটা কিছু নয়। কিন্তু মড্‌সলী সাহেব সংকল্পকে মানব হৃদয়ের ক্ষুদ্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

হারমেন সাহেব বুঝিলেন এবং বলিলেন (২) বাহ্যজগতে বা মনুষ্য দেহ যন্ত্রে বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, আমরা উপলব্ধি করিতে পারি আর নাই পারি তৎসমস্তই সংকল্পমূলক"। আরেক দফা দেখুন, মুনিঋষিদিগের আবিষ্কৃত যোগ সাধনা একটা কিছুই নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য থিওসপি (যোগ সাধনা) দ্বারা অসম্ভব কার্য্য সিদ্ধ হয়। মেডেমব্ল ভাটাস্কি নাম্নী এক মহিলা যোগবলে যখন ভারতে অলৌকিক কার্য্য দেখাইলেন তখন আমরা বুঝিলাম যোগ সাধনায় কিঞ্চিৎ রহস্য থাকিতে পারে। ধ্যানমগ্ন আর্য্য মুনিঋষিগণের অগাধভক্তি-

---

(১) The Deity is one because it is infinite. It is triple because it is ever-manifesting.

(২) All Voluntary and involuntary actions in nature and in the organism of man originate in the action of will, whether or not we are conscious of its.

ব্যঞ্জক স্বতঃ-প্রকাশিত স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা ঐশরূপা লাভ করা যায় না; কিন্তু ক্ষণিক, নিমিলিতলোচন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট বিধর্ম্মী গুরুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবোদ্দীপক পদ্যগদ্য বিমিশ্রিত ঠেকাতালে বিরচিত ঐশগুণ গান শ্রবনে আমরা বিমোহিত হই। এ প্রকার কত কি বলিব? যে কোন বিষয়ে দৃষ্টি করা যায় তাহাতেই আমাদের এ প্রকার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশীয় কোন ব্যক্তি কিছু বলিলে আমরা মেঘনাদ-বিনিন্দিত স্বরে কুঞ্চিতকপালে "ইহাতে কিছু হয় না, ইহা মিথ্যা কথা" ইত্যাকার গুরুগম্ভীর মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্য-দেশাগত কোন মহাত্মা যখন আমাদিগকে সেই উপদেশই প্রদান করেন তখন গললগ্নীকৃতবাসে বিনয়াবনত মস্তকে সুশীল শিশুটীর মত মনযোগ পূর্ব্বক সমস্ত অভ্যাস করি এবং সেগুলি সত্য অভ্রান্ত, কার্য্যকারী, সম্ভব বলিয়া স্বীকার করি!! ব্যাপার খানা কি? আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন? নিজের ভাবে নিজের উন্নতি করিতে অনিচ্ছুক কেন? নিজের দ্রব্যে অবহেলা, নিজের দ্রব্যে ঘৃণা, নিজের প্রতি তাচ্ছল্য কেন? আত্ম বিশ্বাস নাই কেন? আত্মহিতার্থে পরের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হয়; পরের সহিত সৌহার্দ্দ রাখিতে হয়, পর হইতে ভালবাসা আদায় করিতে হয়; কিন্তু তাই বলিয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটাইতে হয় না। পরের জিনিষ দেখিতে হয়, জ্ঞানের চক্ষুদ্বারা; কামনার চক্ষু দ্বারা সংসারের কোন জিনিষ দেখিতে হয় না। কোন্ জিনিষ কি ভাবে নির্ম্মিত হয়, তাহার উপাদান কি কি, কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায়, তাই দেখ, তাই শিখ, তাই অনুসন্ধান কর; অন্ধ থাকিও না। আজ যাহাদিগকে উন্নত দেখিতেছ তাহারা দেখিতে জানে, অনুসন্ধান করে; তাই তাহারা অগ্রবর্ত্তী আর তোমরা পশ্চাৎবর্ত্তী; বহু পিছনে পড়িয়া গিয়াছ। আর একটু খোলশা করিয়া বলিতে হইল। তোমাদের দেশীয় জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন

প্রভৃতি শাস্ত্র বিদেশীয়গণ তোমাদের নিকটই শিক্ষা করিল, পরে নিজের ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া দেশের সকলকে জ্ঞাপন করিল; শিখাইল, সকলেই সেসব জানিল, শিখিল, তাহাতে পণ্ডিত হইল; ক্রমশঃ তাহার উন্নতি করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিল; ছাত্র এখন শিক্ষক হইয়া দাঁড়াইল। আবার দেখ ভারতের বস্ত্র—শিল্প জগতের একমাত্র সম্বল ছিল। এ শিল্প ভারতবাসীরই আবিষ্কৃত, ভারতবাসীদ্বারা উন্নত, ভারতবাসীদ্বারা প্রচলিত। তাই দেখিয়া বিদেশীয়গণ এ দেশে আসিয়া বস্ত্র শিল্প শিক্ষা করিল, দেশে যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল; পরে কি ফল দাঁড়াইয়াছে তাহাতো স্বচক্ষেই দেখিতেছ; বাতাস একবারে উল্টা হইয়া গিয়াছে। এ প্রকার যে কোন শিল্পের দিগে দৃষ্টি করিবে তাহাতেই এ রহস্য দেখিতে পাইবে। ভারতবাসীর উপ্তবীজ পরের দ্বারা সিঞ্চিত জল প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, ফলও পরেই ভোগ করিতেছে। আর তোমরা উচ্ছিষ্ট ফলের আস্বাদ গ্রহণে কৃতার্থ হইতেছ। অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অনেকগুলি অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিলাম। মনের আবেগ প্রসূত এই কথা গুলি আপনারা ক্ষমা করিবেন।

এখন প্রশ্ন এই যে আমাদের অবস্থা এই প্রকার হয় কেন? সামাজিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিলেই বোধ হয় আমরা সহজে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। তাই সামাজিক অবস্থার আলোচনা দরকার। কিন্তু আলোচনা করে কে? সমাজের অবস্থা সমাজই দেখিবে, সমাজেই আলোচনা হইবে, সমাজই ব্যবস্থা করিবে, সমাজই প্রতিকার করিবে। তাই সমাজের প্রয়োজন, তাই সভার প্রয়োজন, তাই দশ জনের প্রয়োজন, তাই „দশে মিলে করি-কাজ।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সভাসমিতি।

হিন্দুর সমাজ ব্রাহ্মণ পরিচালিত, ব্রাহ্মণ উহার কর্ত্তা ছিল, ব্রাহ্মণ উহার কর্ত্তা আছে, ব্রাহ্মণ উহার কর্ত্তা থাকা উচিত। তাই ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন, সামাজিক আলোচনাই ইহার উদ্দেশ্য।

সভা সমিতি কথার কথা নহে। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ কিম্বা প্রতিপত্তির জন্য নহে। ইহাতে সমাজের যে মঙ্গল সাধিত হইবে ব্যক্তিগত ভাবে সকলেই তাহার অধিকারী। ইহার আবাহক আহুত কেহই নহে; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যিনিই ইহাতে যোগদান দেন তিনিই ইহার পৃষ্ঠপোষকরূপে গৌরবান্বিত হইবেন। তবে কার্য্যাদির আলোচনার জন্য এবং সময়াদি নির্দ্দেশ করিবার জন্য ভারার্পিত এক কিম্বা একাধিক বিশিষ্ট লোক নির্দ্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। যাহাতে বাস্তবিক সমাজের মঙ্গল সাধিত হয় তদনুরূপ সুবন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। "নামকা ওয়াস্তে' একটা সভা করিয়া পত্রিকাদিতে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করতঃ লোকের নিকট যশঃ-প্রার্থী এবং যশোভাগী হওয়া এ সভার উদ্দেশ্য নহে। এখানে শুধু পান তামাকের সর্ব্বনাশ কিম্বা সোডালিমনেটের বংশধ্বংশ হইবে বলিয়া আমি আশা করি না। কতকগুলি "হৌক" কথার অবতারণা করিয়া "হউক" কথা দ্বারাই যেন তাহার উপসংহার করা না হয়। আলোচ্য এবং অবধারিত বিষয়গুলি যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য সকলেরই সর্ব্বথা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আরব্ধ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা না করিয়া বিষয়ান্তরে গমন করা কার্য্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায়। সভা সমিতিতে প্রায়ই এসব দুর্দ্দশা দেখা যায় বলিয়া আমাকে স্পষ্টতঃ একথা বলিতে

হইল। সভা যে বাস্তবিকই সভা কার্য্য স্থলে সকলেরই একথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। সভা হাসি খুসির উৎস নহে আমোদ প্রমোদের বিলাসালয় নহে; এ যে চিন্তাতরঙ্গিনীর উৎপত্তি স্থান। উদ্দমের নিভৃত গহ্বর হইতে এ তরঙ্গিনী বহির্গত হইয়া দুকূলবি-ক্ষিত-জলরাশি দ্বারা জগৎ-ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাশক্তিকে বর্দ্ধিত করিতে করিতে উন্নতির মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। চতুর নাবিক অনুধাবনার তরণী আরোহণে তরঙ্গিনী-স্রোতের অনুকূলে গমন করে এবং দ্বিগুণ শক্তিতে শক্তিমান হইয়া অতি সত্তরই মহাসমুদ্রের দর্শন পায়; তাহার অভীষ্টও সিদ্ধ হয়; আর তাহাকে ধরে কে? কিন্তু বোকা নাবিক উল্টা নৌকা চালাইও না; তাহা হইলে সমুদ্রে যাওয়া দূরের কথা, হাবুডুবু খাইয়া পথেই মারা যাইবে। একাগ্রতার বাদাম গাথ, সুবুদ্ধির হাল ধর, অভিজ্ঞতার বৈঠা টান, আর হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাও; ভাবনা কি ভাই, নৌকায় যদি ছিদ্র হয় তবে স্মরণ শক্তির খিল দিও, কোন ভয় নাই বরাবর চলিয়া যাও।

সভাসমিতির আর একটা বিশেষ গুণ আছে। সমাজে কিম্বা দেশে একটা নূতন ভাব, নূতন মত প্রচার করিতে হইলে সভাসমিতি দ্বারা তাহা সহজে সিদ্ধ হয়। চিন্তা-ভাবনার, মতামতের, ভাবাভাবের আমদানী রপ্তানী করিতে সভা বিশেষ দরকারী। এ সমাজে যে মত ঠিক হয় তাহা এ সভার নামে অন্যত্র চালান দিলে যে মূল্যে বিকাইবে, অন্যভাবে চালান দিলে সে দর পাওয়া যাইবে না। পক্ষান্তরে অপর সভার মত এখানে যেমন আদরে গৃহীত হইবে ব্যক্তিগত ভাবে আসিলে সেই মত এ সমাজের চিত্তটা তত আকর্ষণ করিতে পারিবে না। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় সভাসমিতি লোক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আমি আশা করি এ সভা যেন চিরস্থায়ী হয়, উত্থানেই যেন ইহার পতন না হয়, বিদ্যারম্ভেই যেন পাঠ সমাপ্ত না হয়। আমি আরও আশা করি স্থানে স্থানে কিম্বা গ্রামে গ্রামে যেন ব্রাহ্মণদের এ প্রকার সভার অধিবেশন অনতি বিলম্বে সম্পাদিত হয়।

—:*:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ।

আমি একটী কথা যথা স্থানে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; এজন্য আমার স্মৃতিশক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণের সহিত হিন্দু-সমাজের সম্বন্ধটা কি প্রকার তাহার একটু আলোচনা করা সঙ্গত। বিশেষতঃ পূর্ব্বে আমি যে "সমাজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি তাহা দ্ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। "সমাজ", শব্দ দ্বারা সমগ্র হিন্দু-সমাজ এবং সুধু ব্রাহ্মণ-সমাজ এ দুটাকেই পৃথক ভাবে বুঝাইতে পারে। যে যে ভাবে ইচ্ছা গ্রহণ করুন আমার রোক্ কিন্তু প্রথমটার দিগেই বেশী। সমাজ বলিতে এ স্থলে আমি হিন্দু-সমাজকেই মনে করিয়াছি, সুধু ব্রাহ্মণ-সমাজ আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি "ব্রাহ্মণ সর্ব্ব জাতির অগ্রগণ্য"। ইহা চিরন্তন স্বীকৃত সত্য কথা; সুধু ভারতে নহে সমগ্র জগতে, সুধু হিন্দু-সমাজে নহে, অহিন্দু সমাজেও তাই। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের একটা কারণতো চাই। কেহ কেহ বলেন "শাস্ত্রে ঐ প্রকার লিখিয়াছে, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে," এই কারণটা সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু তবু মনে হয় শাস্ত্রে ঐ প্রকার লিখিবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন "উহা

শাস্ত্রকারদিগের পক্ষপাতিত্ব, অথবা ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্রকার, তাই তাঁহারা নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ ঐ প্রকার লিখিয়াছেন"। এই মত কিন্তু আমি অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে পারি না। যে শাস্ত্রকার" প্রমাণাভাবাৎ" ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা যে "প্রমাণাভাবাৎ" ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবেন এ প্রকার সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত। প্রমাণ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আমরা একবার খুজিয়া দেখিব সে 'প্রমাণটা কি?" খোজাখুজির পূর্ব্বে আমি একটু অবসর নিব—আমি অবসর নিব আপনাদিগকে অবসর দেওয়ার জন্য; আমি আপনাদ্দিগকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছি। একটা তামাসা দেখিবেন, ঐ দেখুন দু ডালে দুটা পাখী, একটা কাক, একটা কোকিল, আর এক গাছে একটা বিম্ব অপরটীতে ডালিম, একগাছে পলাশফুল, একগাছে বকুল। আপনারা ইহার কোন্ দফা চান্? কোন্টী ছাড়িয়া কোন্টী নিতে ইচ্ছা করেন? আপনাদের ইচ্ছার যদি কোন বৈষম্য থাকে তবে তাহার কারণটা আমাকে বলিবেন কি? দরকার নাই, যে কারণ আমি খুজিতে ছিলাম তাহা পাইয়াছি—আমার খোজার ফল গুণ; গুণ না থাকিলে লোকে আদর করে না, গুণ না থাকিলে কেহ শ্রেষ্ঠ হয় না, বড় হয় না। তাই বুঝা যায় ব্রাহ্মণের এমন ধারা গুণ ছিল যদ্দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা অতি সহজ। ব্রাহ্মণের গুণ ছিল তাই তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, মান্য পূজ্য। এ লীলা কেবল ব্রাহ্মণের বেলায়ই নহে; পুরাণেতিহাসে জানা যায় গুণিগণ সর্ব্বদাই গুণানুযায়ী আদর সম্মান পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের গুণ ছিল, শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল. ভক্তি ছিল, জ্ঞান ছিল; ইঁহারা জগৎ গড়িতেন, জগৎ ভাঙ্গিতেন; শূন্যে উঠিতেন, পাতালে প্রবেশ করিতেন। তাই ব্রাহ্মণের অলৌকিক ক্ষমতা জগৎ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। ব্রাহ্মণ মহাগ্রহ হইতে

পরমাণুর পর্য্যন্ত তত্ত্ব নিতেন, দেহাভ্যন্তরে জ্ঞাননেত্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৈহিক রহস্য আবিষ্কার করিতেন; ভগবানকে অনুসন্ধান করার জন্য গভীর গহন বনে, বিপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত গহ্বরে, মহাসমুদ্রে, জগতের সর্ব্বত্র গমন করিতেন ; পাতায় পাতায়, গাছে গাছে, ফুলে ফলে ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে পাইয়াছেন। সর্ব্বব্যাপী ভগবান কখনও ইঁহাদের নয়নান্তরে যাইতে পারেন নাই। দেবগণ- ব্রাহ্মণের সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন ছিল। ব্রাহ্মণের অলক্ষিতে কোন দেবতা আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। আর গুণ কাহাকে বলে ? যে গুণে সর্ব্বগুণী জগৎশিরোমণি ভগবান আকৃষ্ট সে গুণের গুণধর গুনিজনাগ্রগণ্য না হইবে কেন ? জগৎ কেন তাঁহাকে গুণী বলিয়া স্বীকার করিবে না ? কেন সম্মান করিবে না ? পার্থিব দেবতারূপে কেন পূজা করিবে না ?

"দেবাধীনা জগৎ-সর্ব্বা, মন্ত্রাধিনাশ্চ দেবতাঃ
তে মন্ত্রাঃ ব্রাহ্মণজ্ঞেয়াঃ তস্মাৎ ব্রাহ্মণ দেবতা।"

অনেক পুরাণ কথা কহিলাম। পুরাণ জিনিষের গুণ বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান কাল অতিবাহিত করিলে, পুরাণ গরিমায় জীবন কর্ত্তন করিলে বর্ত্তমানের স্থায়ী ফল কিছুই হইবে না। পুরাণ কীর্ত্তির আলোচনা দ্বারা অপরকে কি প্রবোধ দেওয়া যায়, না আত্মচিত্তই তাহাতে তুষ্টি লাভ করে ? পুরাণের আলোচনা বর্ত্তমানের শিক্ষামূলক। পুরাণের আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমানকে নিয়মিত করিতে হইবে, বর্ত্তমানের গতিবিধি ঠিক্ করিতে হইবে। পুরাণ পুরাণ বলিয়া কান্দিলেও লাভ নাই, হাসিলেও ফল নাই। বর্ত্তমানকে পুরাণ করিয়া নাচিতে পার তবেই আনন্দ পাইবে যশঃ পাইবে, কীর্ত্তি হইবে, নতুবা সর্ব্বেব বৃথা। আর এক কথা, বর্ত্তমান ভবিষ্যেতের সাক্ষী। ভবিষ্যতে কি হইবে বর্ত্তমান তাই বলিয়া দিতেছে ; বর্ত্তমানে রোগ ভবিষ্যতে মৃত্যু অনিবার্য্য ; বর্ত্তমানে কৃষিনাশ

ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ; বর্ত্তমানে অমনোযোগ, ফল ভবিষ্যতে মনঃকষ্ট। তাই বর্ত্তমানের প্রতি লক্ষ রাখিতে হয়, বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার করিতে হয়। বর্ত্তমানে কি করা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমান কি ভাবে ব্যয়িত হইলে ভবিষ্যতে সুফল ফলিবে আশা করি সমাজ তাহার সম্যগালোচনা করিবে।

জীবদেহের একটা বৈচিত্র আছে। দেহী মাত্রেই দেহের খবর রাখে,—অন্তর্দ্দেহের নাই হউক, বহির্দ্দেহের অবস্থাটা সকলেরই পরিজ্ঞাত। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ লিখা নিষ্প্রয়োজন তথাপি স্মরণার্থ একটু বলিতে হইল। আমাদের শরীরটা মস্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন চর্ম্মদ্বারা আবৃত, প্রত্যঙ্গগুলি পরস্পর সংবদ্ধ; কেশাগ্রের সহিত পদ-নখরের যেমন সম্বন্ধ, পদনখরেরও কেশাগ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ। এক অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের খবর অপর অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ না রাখিয়া পারে না। কেশে যদি কেউ আকর্ষণ করে, পদ তখন চলিতে অনিচ্ছুক হয়, কারণ কেশাকর্ষণ জনিত ক্লেশ পদও বিলক্ষণ অনুভব করে। যে অঙ্গেই আঘাত লাগে, বদনকে উহু উহু স্বরে কাতরতা প্রকাশ করিতেই হইবে। যদি ক্লোরোফরমড্ কিম্বা অচৈতন্য অবস্থায় অঙ্গচ্ছেদ হয় তবে তাৎকালিক দুঃখ কষ্ট হয় না বটে—কিন্তু সংজ্ঞা লাভ করিলে মূহুর্ত্ত পরেই চীৎকার আরম্ভ হয়। তখন বড় যাতনা, বড় কষ্ট!! সময়ে ইহার বৈপরীত্যও দেখা যায়। সুখের বেলায় উরূপরি নিকৃষ্ট অঙ্গ পদদ্বয়কে স্থাপন করিয়া হাত তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, আর মস্তক শিরোমণি শান্তির তান ধরিয়া "বাহা কি আরাম", ২ বলিয়া সখের এবং সুখের চূড়ান্ত করেন। ওহে শিরোমণি! আমি তোমাতে ষষ্ঠী-তৎপুরুষ দেখিতে পাই না; আমি তোমাকে রূপক সমাসের অন্তর্ভুক্ত করিতেছি; তুমি নিজেই তৎপুরুষ, সাবধানে থাকিও। অধীন অঙ্গগুলির খবরাখবর সর্ব্বদা রাখিতে যত্নশীল

হইও, তাহা হইলে শেষে তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না ; কোন অঙ্গ যেন কুপথে যাইয়া ক্ষতবিক্ষত না হয়, সেদিগে দৃষ্টি রাখিও, কেবল রাগের ভরে দোষী অঙ্গকে পরিত্যাগ করিও না, পরন্তু দোষমুক্ত করিয়া আপন অধিকারে রাখ ; যদি ছাড়িয়া দাও, ক্রমশঃ সব হারাইবে ; এর পরে তোমার অস্তিত্ব থাকিবে কি ? সুধু মাথা যে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য ! ! মাথা মহাশয়, মাথা ঠিক রাখিলে কোন গোলেই পড়িবে না ; মাথা যদি ঘুড়াইয়া ফেল তবে বড় বিপদ। চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর কাল মেঘের সঞ্চার হইয়াছে, ভীষণ বেগে শীঘ্রই বাতাস বহিবে। এ বাতাসে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দৃঢ় এবং সবল করিতে হইবে ; তোমার নিজের কার্য্যের উপযুক্ত করিতে হইবে। হাত পা ঠিক না থাকিলে নিজে ঠিক থাকিতে পারিবে কি ? অসম্ভব, বাতাসের আঘাতে ঠিক থাকা দূরের কথা বিনা বাতাসেই যে গড়াইয়া পড়িবে। কাহার উপর নির্ভর করিবে ? তাই বলি সময় থাকিতে সব ঠিক করিয়া লও, আর বিলম্ব করিও না।

ব্রাহ্মনের সহিত সমাজের সম্বন্ধটা ঠিক এরূপ নয় কি ? দৈহিক সম্বন্ধ যেমন, সামাজিক সম্বন্ধও ঠিক্ তদ্রূপ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "ব্রহ্মণেঽস্য মুখমাসীৎ"। সমাজ দেহের মস্তক যে ব্রাহ্মণ তাহা পূর্ব্বেও কথঞ্চিত প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব অটুট, সর্ব্ব জাতির সহিত সম্বন্ধ রাখাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার প্রধান উপায়। ব্রাহ্মণকে কেবল নিজের দিগ দেখিলে হইবে না। অপরাপর সমস্ত জাতির শিক্ষাদীক্ষা, উন্নত্যবনতির-প্রতি ব্রাহ্মণকেই সমদৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপরাপর জাতির উন্নতিতে ব্রাহ্মণের উন্নতি, তাহাদের অবনতিতে ব্রাহ্মণের অবনতি। পা যদি উপরে উঠে মাথাকে উপরে উঠিতেই হইবে, পা যদি অধোগত হয় মাথাও নামিয়া

পড়িবে। একতার অবিচ্ছিন্ন চর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ সমস্ত হিন্দু সমাজের উন্নতি পরস্পর সাপেক্ষ। সুতরাং ব্রাহ্মণের উন্নতি চাহিলে অপর জাতিকেও উন্নতি করিতে হইবে। ব্রাহ্মণকেই—অগ্রবর্ত্তী হইয়া সে চেষ্টাও করিতে হইবে নতুবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। তাই আমি বলিতে ইচ্ছা করি ব্রাহ্মণদিগের উন্নতির উদ্যোগ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে—অপরাপর জাতির উন্নতির চেষ্টাও ব্রাহ্মণকেই করিতে হইবে।

বিপরীত ভাবে একটু বলিতে হইল। অপরাপর সম্প্রদায়কে বলিতেছি। কেহ হস্ত, কেহ উরু, কেহ পদ, কেহই কিন্তু মাথাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণ সমাজের যাহাতে উন্নতি হয় তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তোমরা দৃষ্টি না রাখিলে ইহাদের উন্নতি হওয়াও অসম্ভব। ব্রাহ্মনের মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই তোমাদের উপর নির্ভর করে। তোমাদের বুদ্ধি, তোমাদের পরামর্শ, তোমাদের সহানুভূতি, তোমাদের যত্ন, তোমাদের চেষ্টা, এ কার্য্যে নিতান্ত দরকারী। তোমরা উদাসীন হইলে এ কার্য্য কিছুতেই হইতে পারে না। আমি এই অনুরোধ ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে করিতেছি না। হিন্দুনামধারী, পারিভাষিক কথায়, মালাধারী ব্যক্তিমাত্রকেই বলিতেছি। ব্রাহ্মণসমাজের প্রতি আমি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এস্থলে আমি আরও একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না। ব্রাহ্মণ বলিতে আমি শুধু শ্রোত্রিয় বা কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে মনে করি নাই। বর্ণের ব্রাহ্মণও আমার কথিত ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণের ব্রাহ্মণগণ পরিত্যক্ত বা অবনত হইলে ষোল আনা ব্রাহ্মণ-সমাজের উন্নতি হইল বলিয়া, বোধ হয়, কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। বর্ণের ব্রাহ্মণ যদি উচ্চ শ্রেনীর সংসর্গ না পায় তবে তাহারা উন্নতি করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তাহাদের সম্প্রদায় নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং উন্নত সমাজের অপরিজ্ঞাত। কার্য্যান্তে পতিত

কিম্বা পরিত্যক্ত শঙ্কর জাতির ব্রাহ্মণগণ উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি না পাইলে অধোগত হইবে। পক্ষান্তরে তাহাদের সহায়তায় উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও যে উপকৃত হইবে বা হইতেছে একথাও একবারে অস্বীকার করা যায় না। তাহারা অনুন্নত থাকিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল কি? আমাদের স্বদেশীর হিসাবে ধরিতে গেলে, তাহাদিগকে বাদ দিলে, তহবিলে যে টান পড়িয়া যাইবে। স্বধু তহবিল টান পড়া নহে, স্বদেশীই যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তাহাদের জন্য উচ্চশ্রেণীর কি করা কর্ত্তব্য সময় হইলে তদালোচনা করিব বলিয়া আশা রহিল।

এত কথা তো বলিলাম কিন্তু আমার উপর একটী প্রশ্ন আসিতে পারে সব শ্রেণীর লোকের কথা বলিলাম কিন্তু মুসলমানদের কথা কি? উত্তরে আমার বক্তব্য পূর্ব্ববৎই। হিন্দু সমাজের উন্নতিতে মুসলমানের দরকার নাই কিম্বা মুসলমানের উন্নতিতে হিন্দুর দরকার নাই একথা আমি স্বীকার করি না। জাত্যাভিমানে গর্ব্বিত কেহ যদি এ প্রকার উক্তি করেন আমি তাহাকে সাম্প্রদায়িক দ্বেষাক্রান্ত রোগী বলিয়াই ব্যক্ত করি; স্ববিবেচনার ঔষধ সেবন তাহার পক্ষে আবশ্যক বলিয়া আমি ব্যবস্থা দেই। এক দেশে বাস, একগ্রামে ঘর, গায়ে গায়ে ঘেষা ঘেষী যাতায়াতে সহগামী, এর ধনে তার পুষ্টি, তার যত্নে এর তুষ্টি সব জায়গায় সংযোজক চিহ্ন কেবল জাতিয় উন্নতির বেলায় বিয়োগ চিহ্নটা কেন? সংযোজক চিহ্ন উঠাইবার যো নাই, বিয়োগ চিহ্নটা না

Professor E. H. Hankin—At any rate the caste system makes for cleanliness, and that the high caste Brahmin is undoubtedly clean. He may be saturated with superstition and ignorance according to European ideas, but that was a differents matter and he thought that the leveling up or down of, castes would not benefit the people of the country.

দিলে ভাল হয় না কি ? সূর্য্য উদিলে সকলেই আলো পায়, অন্ধকারে সকলেই ভীত হয় ; বাজারে চাউলের দর চড়িলে সকলেই চিন্তিত হয় ; এ সব ব্যক্তিগত বা সমাজগত ইষ্টানিষ্ট নহে ; ভেবে চিন্তে দেখা উচিত নয় কি ?

আমি যে সম্বন্ধের উল্লেখ করিলাম তাহা ঠিক আছে কি ? আমি দেখিতেছি সম্বন্ধ ঠিক থাকা দূরের কথা বরঞ্চ ক্রমিক বিচ্ছেদের বাড়াবাড়ীটাই বেশী হইতেছে। বিচ্ছেদ হওয়ার কারণও যথেষ্ঠ আছে। কারণগুলিকে দূর করিতে না পারিলে বিচ্ছেদ বোধ হয় অবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। প্রণয়ের ভাবে দেখিতে গেলে দূরে থাকাই বিচ্ছেদের কারণ, ভুলে যাওয়াই বিচ্ছেদের নিদান। কথাগুলি সত্যবটে কিন্তু একজন বলিয়াছিল।

তুমি তো নও বিদেশী, তুমি আমার হৃদয়বাসী,
দেখ্‌তে আমি চাই না তোমায়, দেখ্‌ছি আমি দিবানিশি"।

ভাবটুকু বেশ বুঝা যায়। মন থাকলে সবই ঠিক থাকে, মনে থাকিলে ভুলা যায় না, দেখা হলে সব ঠিক হয়—প্রণয়ের কাজই এরূপ ; ভালবাসার রীতি এ প্রকারই বটে ; ভালবাসা যদি হৃদয়ে থাকে বিচ্ছেদে তার কি করে ? উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক হয়ত বলিবেন ভালবাসা দুই পক্ষেরই চাই, নতুবা পক্ষাভাববশতঃ প্রণয় অচল হইয়া পড়ে। যদ্যপি কথাটা আংশিক সত্য হয়, তথাপি আমি ইহা একবারে স্বীকার করিতে পারি না। ভালবাসাই বলুন আর প্রণয়ই বলুন, মানসিক বৃত্তিগুলি প্রবলা চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঠিক সমফলই উৎপন্ন করে। শীঘ্র কিম্বা গৌণে ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায়, অল্প কিম্বা অধিক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হইবেই হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে ইচ্ছাশক্তির প্রধান কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শক্তির উপরেই হিন্দুর

দেবারাধনা ভগবদ্দর্শন প্রভৃতি নির্ভর করে। এই শক্তিকে চালনা করিতে পারিলে প্রণয় কিম্বা ভালবাসা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। এই শক্তি যথোচিত ভাবে চালিত হইলে বিচ্ছেদের ভয় থাকে না। এই শক্তি দ্বারা শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইকে বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন। এই শক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতভূমে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। এই শক্তি দ্বারা রাজা প্রজাকে বাধ্য রাখেন। চৈতন্যদেব এখন নাই, শঙ্করাচার্য্য স্বর্গগত, তবু তো আমাদের প্রাণে তাঁহাদের জন্য গাঢ় ভক্তি, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করি। কারণ, যে শক্তি তাঁহারা চালিত করিয়াছিলেন তাহার ফল কোথায় যায়? জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের শক্তি অবাধ গতিতে কাজ করিবে। কি জোরের টান!! এমন জোরের টানে বিচ্ছেদ কি আর আসিতে পারে? তাই তো শ্রীহরি বলীর দ্বারে দ্বারবান, তাই তো হরি গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের মস্তকে অধিষ্ঠিত!! তাই বলি টান দিতে পার, টান দাও, না পার তবে শিক্ষা কর বিচ্ছেদের ভয় থাকিবে না। যাই হউক আমরা উপলব্ধি করিতে পারি আর নাই পারি, আমরা অন্যকে যে ভাবে দেখি, অন্যের সহিত যে ভাবে ব্যবহার করি, অন্য হইতেও সেই প্রকার আচরণই পাইয়া থাকি। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ফলোৎপাদনের ন্যূনাধিক্য হয়।

আমার পূর্ব্বোল্লিখিত সম্বন্ধের মধ্যে টানাটানির যথেষ্ট অভাব। কেবল টানাটানির নহে—টানেরও অভাব। টান দিবে কে? আমার মতে ভূদেব ব্রাহ্মণকেই প্রথমতঃ টান দিতে হইবে—পরে দেখিবে টানাটানির ধুম?

সামাজিক বিচ্ছেদের আর এক কারণ সাম্যভাবের অভাব। সাম্যভাব রক্ষা করা যে মিলন রক্ষার একটা বিশেষ উপায় এ পথ অনেকেই

কার্য্যতঃ দেখান না। কেহ হয় তো একদমে হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে সচেষ্ট, যদি উঠিতে না পারিলেন তবে মনের কষ্টে অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিবেন। সমভূমিতে থাকিতে তিনি অনিচ্ছুক। আমি খাব, সমগ্র সংসার গ্রাস করিতে প্রস্তুত; যদি তাহা না ঘটে তবে একবারে উপবাসেই থাকিব। যে পরিমাণ আহার করিলে উদর নিষ্পত্তি হয় তাহাতে আমি সুখী না। অবস্থা তো এই প্রকার, সাম্যভাব লুপ্ত প্রায়। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলতা, অবিশ্বাস, মিথ্যাপ্রবঞ্চনা নীচ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। চিন্তাশীলতা, সুবুদ্ধি, সুবিবেচনা, গুণগ্রাহিতা, পরোপকার, সহানুভূতি প্রভৃতি দেখাইবার অবসর কোথায়? যাহা হউক এখন আমাকে কুল কেটে যাইতে হইবে মাঝ দড়িয়ায় আসিয়া পড়িলে পারে যাওয়া কষ্ট হইবে। আলোচ্য বিষয়ের শেষ না হইলেও আলোচনার শেষ করিয়া এখান হইতে আমি একবার বিদায় হইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উন্নতির স্বরূপ।

এখন আমাদের মূল বিষয়। ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি; পুনরুক্তিদোষের ভয় থাকা সত্বেও আমি আবার বলিতেছি এই সভা যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য! সামাজিক অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এই প্রকার সভা পুনঃ পুনঃ আহুত হওয়া দরকার। আলোচ্য বিষয়ের বাহুল্য এবং কার্য্য সম্পাদনের সৌকর্য্যার্থ এই ভাবে

মাসে মাসে, এমন কি সপ্তাহে সপ্তাহে, সম্ভব হইলে দিনে দিনেও সভার অধিবেশন হওয়া অন্যায় নহে। আমি মনে করি অবস্থা বিশেষে ঐ প্রকার ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য।

এইক্ষণ সভার আলোচ্য বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। আমাদের আলোচ্য বিষয় "জাতীয় উন্নতি"। এই রবটা এখন প্রায়ই শুনা যায়। নবাগত "স্বাধীন চিন্তার" সঙ্গে ঈদৃশ রবের আমদানী অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বিষয়টা কি প্রকার আগে তাহাই ঠিক করা কর্ত্তব্য। "জাতীয় উন্নতির" স্বরূপটা কি প্রথমতঃ তাহাই দেখা উচিত। স্বরূপ ঠিক করিতে না পারিলে ধ্যানধারণা চিন্তাবর্ণনা করিব কাহার? কাজ করিব কি?

এই প্রকার রূপ ঠিক করিতে যাইয়াই হিন্দুরা পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন; আমাকেও যদি কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাদৃশ নিন্দা করেন তবু "কিম্ভূতকিমাকার," "অবাঙমনসোগোচর" একটা কিছুর স্তবস্তুতি করিতে পারিব না। কাজে কিছু করিতে পারি আর নাই পারি রূপটা কি প্রকার দেখিতে একবার চেষ্টা করিব।

উন্নতির রূপ ঠিক করা বড়ই কষ্টকর। এতৎ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিতরূপ কিছু বলেন নাই। একবারে গোড়া হইতে ধরুন। বেদাদিতে জাতি নিয়া বিশেষ বাড়াবাড়ী করে নাই—অধিকার অনুসারে পৃথক পৃথক মন্ত্রের নির্দ্দেশ করিয়াছে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির স্বরূপ বেদবেদান্তাদিতে পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তারপর ধরুন বৃন্দাবনের সেই কেলে ছোড়াকে। কালাচাঁদ কত কি কাণ্ড করিলেন!! কত ভাঙ্গিলেন, কত গড়িলেন, কত অগাসুর বকাসুর বধ করিলেন, কংশ ধ্বংশ করিলেন, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন না। নিজে সাধুটী সাজিয়া রহিলেন; উপদেশচ্ছলে বলিলেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। ভাবে বুঝাযায় ধর্ম্ম রক্ষাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য; কিন্তু গীতোক্ত "তত্ত্বমসি"র-

দিগে লক্ষ করিলে দেখাযায় ধর্ম্ম কর্ম্ম যাহা কিছু সবই সেই ভগবান— অনন্যমনে ভগবানকে ভাবিলেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরকে উপদেশ দিয়া, পরের উপকার করিয়া, পরের কাজ করিয়া তিনি কত নাম কিনিলেন—প্রথমতঃ "কেলে ছোড়া" তারপর কালাচাঁদ, কৃষ্ণ-ঠাকুর, শেষ দফায় ভগবান ; তিনি এত তো করিলেন তবু জাতীয় উন্নতির রূপটা তিনি ঠিক করিলেন না। তাঁহার হাতে যে সুযোগ সুবিধা ছিল তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু করিতে পারিতেন। গীতায় কৃষ্ণ যে জাতি ভেদটা করিলেন তাহা একটু উল্টা করিয়া দিলেই তো বেশ হইত ; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। কাজেই জাতীয় উন্নতিটা কৃষ্ণের ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। ইহাকে ছাড়িয়া দেখুন দেখি রাবণ বেটার কাণ্ডটা। রাবণ দেবতাগণকে বন্ধন করিয়া আনিল, তাঁহাদিগ দ্বারা কত কিছু কাজ করাইল, ঘোড়ার ঘাস পর্য্যন্ত কাটাইল, তবু বেটা রাক্ষস নামটা বদল করিল না। রাবণের ইচ্ছা হইলেই দেবতাদের নিকট হইতে একটা দলিল লিখাইয়াও উন্নতির চূড়ান্ত করিতে পারিত। জাতীয় উন্নতির বুদ্ধিটাই রাবণের ছিল না ; রাক্ষস কি না ? তাই রাক্ষসই রহিয়া গেল। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেখুন দেখি রামই বা কি করিলেন ; স্বয়ং ভগবান রাম প্রজার মনোরঞ্জনার্থ সতী লক্ষ্মী সীতাকে পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিতা করিলেন ; কিন্তু স্বজাতিয় উন্নতি কিছুই করিলেন না। তিনি চেষ্টা করিলে স্বজাতিটাকে আরও একটু উপরে উঠাইতে পারিতেন না কি ? বড় দুঃখে তাঁহাকেও ছাড়িতে হইল। সুধু তাহাকে কেন প্রাচীন কালের সকলকেই ছাড়িতে হইবে। কংশ, জরাসন্ধ, কুরু, পাণ্ডব, কর্ণ ইঁহাদের কাহারও নিকটেই জাতীয় উন্নতির রূপ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম। তার পর দেখুন আমাদের সংহিতা-গুলি। তাহাতেও সেই অভাব। কৃষ্ণ যেমন জাতিটাকে গুণের

সহিত এবং কর্ম্মের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, সংহিতাকারগণও তাঁহারই ধুয়া ধরিয়া জাতিটাকে ব্যবসায়গত বা কর্ম্মগত করিয়া রাখিয়াছেন। জাতিমাত্রই যাহাতে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে তন্নিমিত্ত নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কঠোর নিয়মাদিও করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পুরাণগুলিতো উপন্যাসই! যদি বা সে গুলিকে ইতিহাস বলিয়া ধরা যায় তবু তাহাদিগ দ্বারা জাতীয় উন্নতির স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। পুরাণকারদিগের উচিত ছিল কতকগুলি "নূতন" লিখিয়া যাওয়া। এইবার দেখুন তন্ত্রশাস্ত্রগুলি। ৬৪খানা তন্ত্র প্রচলিত, সব গুলিরই বর্ণিত বিষয় এক—"সাধনায় সিদ্ধিলাভ"; ধ্যানাধিগম্য কত কোটী কোটী দেব দেবীর রূপগুণ বর্ণনা করিল কিন্তু জাতীয় উন্নতির স্বরূপ বর্ণণে তন্ত্রগুলিও অক্ষম। আমরা শুনিতে পাই পূর্ব্বকালে তান্ত্রিক কার্য্যদ্বারা কত অসাধ্য সাধন হইয়াছে!! এখন কিন্তু তাহাদের সে নাম কাম নাই; বঙ্গদেশে তান্ত্রিক আলোচনা লুপ্ত প্রায়; বোধ করি জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে কিছু বলে নাই বলিয়াই তন্ত্রের এত অনাদর।

এখন জাতীয় উন্নতির স্বরূপ পাই কোথায়? পুরাণ পুথি পুস্তকতো তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, ফল কিছুই হইল না। এখন বাকী আছেন সাধু সন্ন্যাসী; দেখা যাউক তাঁহাদের কাছে কিছু মিলে কি না। মুনিঋষিদিগের কাছে কিছু পাওয়ার যো নাই—কারণ তাঁহারা চুপটী করিয়া বসিয়া থাকেন আর মনে মনে কি বলেন, তাহা সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই! দরকার নাই আমাদের মাথা ঘামায়ে; চলুন সাধুদের নিকটে; এঁরাও, দেখিতেছি সেই মুনি জাতীয়ই প্রায়। কেউবা উলঙ্গ, কেউবা মৌন, কেউবা কৌপিনধারী জটা-জুটবিলম্বিত, নগ্নপদ, কেউবা একাহারী, কেহবা ফলাহারী; ইহারা

নাকি ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ, তপ দ্বারা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ উন্নতি করিয়া থাকেন ; এঁদের এসব কাণ্ডকীর্ত্তন নাকি "ব্রহ্মচর্য্য"। সংসার যাঁহারা বুঝেননা তাঁহাদের নিকট আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না ! তবে চলুন দেখি একবার ধর্ম্মবক্তাদের নিকট। শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতির দশাও দেখিতেছি তাই। বুদ্ধদেব "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন আর জাতিটা ধরিলেন না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মটাকে ওদিকে সমুদ্র পার করিয়া দিলেন আর এদিকে হিমালয় পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া একবারে তাড়াইয়া দিলেন ; আবার সেই "সাধনায় সিদ্ধিলাভ" দেশময় করিয়া ফেলিলেন। আমাদের চৈতন্যদেব কিন্তু আর এক পথে গেলেন। ইনি আর জাত বেজাত মানিলেন না—ভক্তির স্রোতে একদম "নৈদে ভাসাইয়া দিলেন"। তাতেই "শ্রীচৈতন্য ভগবৎভক্ত নচ পূর্ণ নচাংশকঃ"।

এসব তো গেল ; এখন আমাদের উপায় কি ? জাতীয় উন্নতির জন্য যাই কোথায় ? চলুন একবার ইউরোপে ; দেখুন সাহেবেরা বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধনে জনে জগতে অতুলনীয় হইয়াছেন। এঁদের সব কাজই বুঝা যায় ; এঁদের ভাষাও আমরা বেশ দখল করিয়াছি, দুকথা বলিতে পারি, লিখিতে পারি ; এঁদের হাব্‌ভাব্‌ভঙ্গী সবই শিখিয়াছি, মাঝে মাঝে বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপন করি কিন্তু এদের ঐ মন্ত্রটা শিখিতে পারি নাই যে মন্ত্র বলে ইঁহারা জগতে শীর্ষ স্থানীয় হইলেন। ইহঁাদের উন্নতির মন্ত্রটা একবার আমি শুনিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইতেছে—ভাবটুকু কিছু শক্ত, স্বধু কোট পেণ্ট পরিলে চলে না, একটু খাটিতে হয়, হাত পা নাড়াচারা করিতে হয়—মুখ বাজীটা কম করিয়া বুক বাজীটাই বেশী

করিতে হয়; বড় শক্ত কথা, ওসব যাক্। ইউরোপে জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে দেখিবার, শুনিবার, শিখিবার যখন কিছুই নাই, চলুন একটু কষ্ট স্বীকার করি। একটা বিষয় শিখিতে হইলে উৎসাহ দেখাইতে হয়, সাহস করিতে হয়। চলুন্ এট্‌লান্টীক মহাসাগর পার হইয়া যাই—সাগর পারে যাইতে হইবে বলিয়া আপনারা কেহ ভয় করিবেন না। সমাজে উঠিবারও সুপথ আছে। "বিদুষাং পরামর্শঃ" মতে ব্যবস্থা পাইবেন; অধিকন্তু ব্যবস্থানুযায়ী পাপের উল্লেখ করিলে অর্থাৎ পাপানুযায়ী ব্যবস্থা না চাহিলে কত জনেই পাতি দিবে। তাহাতেও যদি আপনাদের মনে না মানে তবে আমি বলিতেছি শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। "ত্রিধাপাপমুৎপদ্যতে" একথা অনেকেই জানেন না, জানিলেও বুঝেন না। আপনাদের ভয় নাই শীঘ্রই "বিদেশ গমনের ব্যবস্থা" বাহির হইবে।

চলুন্ একবার আমেরিকায়। দেখিয়াছেন কাণ্ড কারখানা—৭৫ পঁচাত্তর তালা দালান, কলে উঠে, কলে নামে। বৈজ্ঞানিক মতে কৃষিকার্য্য হইতেছে, কত অপর্য্যাপ্ত শস্যোৎপাদন হইতেছে। সব কাজই বৈজ্ঞানিক উপায়ে করা হয়; দেখিয়াছেন কত কল কারখানার ছড়াছড়ি !! কিন্তু এসব দেখিয়া কিছু ফল হইবে না। আমাদের মতে এদেশে শিখিবার বিষয় কিছুই নাই। চলুন্ এখন দেশে ফিরি; তবে একটা কাজ করিলে ভাল হয়। চলুন্ এধার দিয়ে জাপান দেশটা দেখিয়া যাই। জাপানের দশাও দেখিতেছি তথৈবচ—কেবল কল কারখানারই বাড়াবাড়ী, লোকগুলি কেবল ছুটাছুটী করে; স্ত্রীপুরুষ উভয়ই কর্ম্মশীল, কেহই অলসভাবে থাকে না। দলাদলি, বিবাদ বিসম্বাদ খুব কম—এমন দেশে কি আমরা থাকিতে পারি? এদেশেও আমরা জাতীয় উন্নতির আদর্শ কিছু পাইব না। চলুন্ দেশের

চাঁদ দেশে যাই। বরঞ্চ দেশে যাইয়া এই স্বদেশীর দিনে স্বদেশী হই—বোধ করি এ সুযোগে জাতীয় উন্নতিটা দেশেই পাইব, নাই বা পাইব কেন? আমাদের ভারত রত্নপ্রসূ—ভারতে সব আছে। জাতীয় উন্নতিও স্বদেশের ভাবে নিশ্চয়ই আছে। এই দেখুন, স্বদেশী মতে আমাদের পূর্ব্বে যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন তাঁহারা কেমন সুন্দর উন্নতি করিয়াছেন!! আমরা বৃথা সমস্ত পৃথিবীটা ঘুড়িয়া হয়রাণ হইয়াছি। জাতীয় উন্নতির একটা লক্ষণ দেখুন—কর্কশ শব্দগুলিকে শ্রুতি মধুর করিয়া নেওয়া কিম্বা দীর্ঘস্বরের স্থলে হ্রস্ব স্বর ব্যবহার করা (এই যেমন এক নূতন পাণিনী) যথা বন্দ্যোপাধ্যায়—বানার্জ্জি, মুখোপাধ্যায়—মুখার্জ্জী, দত্ত—দাত্, বসু—বোস্, চক্রবর্ত্তী—চকর বকর্, দাস—ডস্, ক্ষেত্রমোহন খেটারমোহন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি উন্নতি করিতে এমন সহজ পথ আর নাই। জাতীয় উন্নতি সাধনার্থ আমাদের দেশে আরও অনেক গুলি সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমস্ত গুলির উল্লেখ করা এ স্থলে বড়ই কষ্টকর; মোটামুটি দুই একটা ধরিয়া দেখুন। বিশৃঙ্খলতা ব্যভিচার দমন করার দরকার নাই, জাতিভেদটা উঠাইয়া দিতে হইবে; অবিবাহিতা কন্যাদের স্বামী আবশ্যক করে না কিন্তু "বিধবাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে"; শিল্পোন্নতি দ্বারা জিনিষ প্রস্তুত না হউক কিন্তু "খাটী স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে হইবে"; গৃহ-নীতির চিন্তা নাই কিন্তু "রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে হইবে", বালকদের শিক্ষার উপায় নাই কিন্তু "বালিকাদিগকে বড় বড় রকমের শিক্ষিতা করিতে হইবে"। উদ্ধৃত সমস্ত কথার প্রতিবাদ করা যদ্যপি আমার উদ্দেশ্য নহে তবু বলিতে হইল গাছে ফল থাকুক আর নাই থাকুক, ফল খাইবার আশায় উর্দ্ধমুখে "হা" করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা সঙ্গত কি?

আমাদের দেশে আরও এক দফা জাতীয় উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেশের পক্ষে অবশ্য এটা শুভলক্ষণ! জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে বড় হইতে হইবে। এখন এ বাতাসই খুব ধুমে ধামে চলিতেছে। বাস্তবিক সমাজের প্রত্যেকের অবস্থাদির খবর নিয়া ব্যবস্থা করা বড়ই কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ। এই প্রকার সূক্ষ্মতত্ত্বে যাঁহারা না যান তাঁহারা বাস্তবিকই মস্তিষ্ক এবং সময়ের সদ্ব্যবহার জানেন--এ জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি। লক্ষণ শক্তিশেলে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, আর বাছা হনুমান গেলেন বিশল্যাকরবি আনিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে। বীরকেশরী হনুমান ক্ষুদ্রের দিগে দৃষ্টি না করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতটাই মাথায় করিয়া আনিল। আমরা জানি না রামচন্দ্র লক্ষণকে ঐ পর্ব্বতটাই সেবন করাইয়াছিলেন কি না? আমাদের জাতীয় উন্নতির নমুনাটাও ঐ প্রকার। ক্ষুদ্র দৃষ্টি বাস্তবিকই নীচজনোচিত। জাতীয় উন্নতি করিব, একদম সমস্ত জাতিকে উপরে উঠাইয়া ফেলিব। নামান্তর করিয়া জাতীয় উন্নতির চূড়ান্ত করিতে কিছু মাত্র আয়াস নাই, অপর কাহারও সহায়তারও দরকার করে না। একটা সভা আর একটা লিখা, যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারিব, ভাবনা কি? উন্নতির মূল মন্ত্র "মাণিক্যরাম, আমি রাজা অমু" ইহা মনে রাখিলেই হইল। উন্নতির এ পথটা যে খুব সুগম তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু একটা কারণে মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। আমাদের দেশীয় নেতৃগণ এতৎসম্বন্ধে কোন উচ্চ বাক্যই করেন না। কেবল নামের দ্বারা যদি কাম হইত তবে তাঁহারা নীরব, নিশ্চেষ্ট কেন? তাঁহারা এদিগ ওদিগ কত দৌড়াদড়ি করেন; কত শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় করেন; কত দুঃখ কষ্ঠ ভোগ করেন, আত্ম হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়া পরের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেন; কিন্তু একটা ধন্যবাদ পাওয়ার জন্যও যে ইঁহারা ব্যগ্র হন না ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!"

ইঁহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হইতেছে যে ইঁহারা নূতন পথের পথিক নহেন। তজ্জন্য আমাদিগকেও কিছু গোলে পড়িতে হইল। আমরা কায়মনোবাক্যে ইঁহাদের অনুসরণ না করিয়া পারি না। কাজেই তাঁহারা অগ্রগামী না হইলে জাতীয় উন্নতির পথে আমরা চলিতে পারি না।

যাহা হউক, এখন আমাদের গতি কি? জাতীয় উন্নতির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া কত কাল অতিবাহিত করিয়াদিলাম, কত দেশময় ভ্রমণ করিলাম, ফলে কিছুই পাইলাম না। তবু আর একটী বিষয় আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি; হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্র গুলি একবার অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়, অন্যায় হইবে না। বিশেষতঃ ইউরোপে এমেরিকায় আমাদের দর্শন শাস্ত্র নিয়া বড়ই আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে; তাহাদের ভূয়শী প্রশংসাও শুনা যাইতেছে। হিন্দু দর্শন নাকি জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু দর্শনগুলির বিশেষত্ব কি আমরা তাহা বুঝিলাম না। আমাদের কর্ম্মজীবনে কিম্বা ধর্ম্মজীবনে দর্শন শাস্ত্র উপকারী এবং দরকারী কিনা তাহাও একবার দেখিলাম না। যাই হউক আপনাদের কথানুসারে একবার আলোচনা করা যাউক; কিন্তু আমার বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে দর্শন শাস্ত্রেও কিছু মিলিবে না। এই দেখুন না কেন? সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ, পাতঞ্জলির মায়াবাদ, ন্যায়ের পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে। আমরা চাই জাতীয় উন্নতি, ওসব তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে? দর্শনের আলোচনা অপেক্ষা বাজারের ভেজাল চিনিও অনেকাংশে ভাল, দর্শনের আলোচনায় সময় নষ্ট না করিরা বরঞ্চ খোকারামের বাড়ীর শ্রাদ্ধের চিরার যোগার করাও অনেকটা ভাল। চিরা দধি খাই কি না খাই তদুপলক্ষে দু চার রাত্র অনিদ্রা ভোগ করিয়া ছলচাতুরীর জাল বিস্তার করিয়া শেষ দফায় একটা গণ্ডগোল বাঁধাইতে পারিলেই বা মন্দ কি?

এ সব কাজে দেশে প্রতিপত্তি বাড়ে, বেশ নামকাম ও হয়। তাই এখন দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পরিত্যজ্য। বৃথা সময় নষ্ট করিলাম কিন্তু জাতীয় উন্নতির স্বরূপ কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।

অদ্য আমাকে সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু আপনারা মনে রাখিবেন আমি বাঙ্গালী—বাঙ্গালীর মাথা আছে, মাথাতে কিছু সারবান পদার্থও আছে। উন্নতির স্বরূপ একটা কিছু বাহির না করিয়া আমি ছাড়িব না; অবশ্য অদ্য নয়, অবসর মত বসিয়া উন্নতির রূপ ঠিক করিব।

ব্রাহ্মণ সভাতে জাতীয় উন্নতির স্বরূপ ঠিক করিতে না পারিয়া আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। বিশেষতঃ জাতভায়াদের নিকট অপদস্থ হওয়া বড়ই কষ্টকর বিষয়। যুক্তি কারণ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি আর নাই পারি মুখের জোরে দুচার কথা বলতে আমি ছাড়িব না। আমি ব্রাহ্মণ সমাজের নিকট সানুনয় প্রার্থনা করি কেহ যেন নামের দ্বারা উন্নতি করিতে চেষ্টা না করেন। কাজ করিলে নাম আপনা হইতেই আসে; কিন্তু কাজ না করিয়া যে নামের ভিখারী হইতে যায় তাহাকে বড়ই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, শেষটা "উপাধি ব্যাধিরেবচ" হইয়া দাড়ায়। যাঁহারা বিনা কাজে নাম করিতে চাহেন কিম্বা অপরের নামে আত্মপরিচয় দেন তাঁহারা বাস্তবিকই সমাজে ভয়ানক গণ্ডগোল বাঁধান; কাজের বিষয় চিন্তা করিতে নিজেরাও অবসর পায় না অপর কেও অবসর দেয় না। বায়ুরাশি হাতে মুট করিয়া ধরিতে চেষ্টাকরা আর নাম প্রার্থী লোকের যুক্তি তর্ক শুনা একই কথা। এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কিছু বলিতে হইলে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিতে হয়। গুণের আদর করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেওয়া যে একটা গুণ সুধু এই কথা বলিয়াই আমি এ স্থানে ক্ষান্ত হইব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য নির্ণয়।

জাতীয় উন্নতির রূপ যখন কিছু ঠিক করিতে পারি নাই তখন সে সম্বন্ধে আমার আলোচ্যও কিছু নাই। আমার বিশেষ বক্তব্য এই যে "জাতীয় উন্নতি" কথাটা পর্য্যন্ত লোপ পাইলে মন্দ হইত না। তবে একটা সভা হইলে তাহার আলোচ্য বিষয় একটা কিছু অবশ্যই চাই। প্রতিমা নির্ম্মিত হইলে তাঁহার পূজা অবশ্যই দিতে হয়, আমাদের শাস্ত্রে এ প্রকার উপদেশ আছে। সুতরাং আমাকেও সভার আলোচ্য বিষয় যাহা কিছু একটা অবধারিত করিতে হইবে।

বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য আমি নিম্নলিখিত তিনটী ভাগে বিভক্ত করিলাম। (১) সভার প্রতিষ্ঠা (২) শিক্ষা (৩) অর্থাগম।

(১) "যা নাই তা চাই"। আমাদের দেশে সভা সমিতি নাই; সুতরাং একটা সভার প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। এই সভার আকৃতি এবং বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমার আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহা পরে বলিব।

(২) শিক্ষা সম্বন্ধে। ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষার সম্বন্ধে বলিতে গেলে মনে বড়ই নৈরাশ্য উপস্থিত হয়। বিদ্যাশিক্ষা যে এ সমাজের পক্ষে প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে ধারণা যেন অনেকের মনে আদবেই নাই। যাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা উপদেশের উপর সমগ্র হিন্দু-জাতির উন্নতি অবনতি, মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে তাঁহাদিগকে নীরব, নিশ্চেষ্ট, উদাসীন প্রায় দেখিয়া মনে বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময় সমাজ যে অবস্থায় দাড়াইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা যদি এখনও না হয় তবে ভবিষ্যতের ফল বড়ই বিষময় হইবে—

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বোধ হয় বিনা আপত্তিতে একথা স্বীকার করিবেন। "ব্রাহ্মণ লিখা পড়া জানে" একথাটা এখন অনেক স্থলেই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে দেখিয়া মনে নিদারুন আঘাত লাগে। অতঃপর বোধ হয় ব্রাহ্মণকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে তিনি লিখা পড়া জানেন কিনা? এতদপেক্ষা অবনতি আর কাহাকে বলে? এইটা ভয়ঙ্কর পরিতাপের বিষয় নয় কি? এ দিগে দৃষ্টি করে এমন লোক কি কেহ নাই?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা।

আমাদের দেশে লিখাপরা না হওয়ার কয়েকটী কারণ আছে:—

(ক) অর্থাভাব। অনেকেই অর্থাভাব বশতঃ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে পারে না। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও কেহ সাহায্যকারী হয় না। কাজেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি থাকা সত্ত্বেও, অনেক হতভাগা শৈশবেই নিরাশ হইয়া পড়ে; দারুণ দুঃখানলে সারাজীবন দগ্ধ হইতে থাকে। একদিগে প্রবল বাসনা অপরদিগে অভাবের দারুণ যাতনা—শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায়, তাহাদের কোমল হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে!! সে জ্বালা বড় জ্বালা, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ জানেনা। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার শেষ জ্বালা ব্যতীত এ জ্বালা নির্ব্বানের আর উপায় নাই।

(খ) অভিভাবকের অমনোযোগিতা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতা। অনেকে টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও বালকদিগকে বিদ্যাভ্যাসে বিরত

করে ; লিখাপড়া শিক্ষার আবশ্যকতাই তাহারা খুঁজিয়া পায় না। তাহাদের যে বিষয় সম্পত্তি আছে তদ্দ্বারা বালকদিগের শিক্ষার্থ অর্থব্যয় নিরর্থক মনে করে।* কিন্তু সাধের বালকগণ সঞ্চিত অর্থরক্ষা করিতে সমর্থ কিনা সে বিবেচনা করিয়া দেখা অভিভাবকের কর্ত্তব্য নহে কি ? অশিক্ষার দরুণ কত উচ্চ বংশ একবারে অধঃপাতে যাইতেছে। ইহা দেখিয়াও যাহাদের জ্ঞানোদয় হয় না তাহারা কি জাগ্রত না নিদ্রিত !! কি উপায়ে ইহাদের জ্ঞানোদয় হইবে বুঝিতে পারি না। আমাদের দেশে অনেক বড় লোক এই কারণেই অবনতির দিগে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছেন। তাঁহাদের দুর্দ্দশা দূরে থাকিয়া অনেকেই চিন্তা করে ; সাক্ষাতে কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না, কারণ কর্ত্তারা "বড় লোক"। বড়লোকের বড়ত্ব কিসে রক্ষা পায় কলে কৌশলে তাহা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ধনী মহাত্মা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে "বালকগুলির পাঠে মনোযোগ নাই" ; কাজেই যত্ন চেষ্টায় ইতি। কিন্তু আমরা জানি কর্ত্তারাই অমনোযোগী ; অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই সমস্ত দোষ বালকের ঘাড়ে !!

(গ) অর্থশালীলোকের বালকের প্রতি অতিরিক্ত আদর। বালকদিগকে শাসনাধীন রাখা শিক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু অনেক স্থলে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। বালক আব্দার করিয়া যাহা কিছু চায় অভিভাবক তাহাই দিতে প্রস্তুত। বালক যে পথে যাইতে ইচ্ছা করে অভিভাবক তাহাই অনুমোদন করে। ফলে বালকগণ বিলাসী, দুর্নীতি পরায়ণ, ব্যভিচারী, দুষ্ট হইয়া পড়ে ; ভবিষ্যৎ জীবন একবারে কলুষিত করিয়া ফেলে। অনিষ্টজনক আব্দার যে ভয়ঙ্কর অনাব্দারের কারণ ইহা অনেক মহাত্মারই জ্ঞান নাই। অনেক স্থলে দেখিয়াছি বালকগণ অভিভাবক হইতেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে

তামাক, মদ্য, গাজা প্রভৃতি নেশা খাওয়ার অনুমতি পাইয়া থাকে। অনেক বালক যে কুপথগামী হয়, অভিভাবকই তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। দুষ্টামির দমন না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিলে দুষ্টামি কি কমিতে পারে? শেষে অভিভাবকদের নিকট শুনা যায় "শিক্ষকের দোষে বালকের লিখা পরা হয় না।" শিক্ষক বেচারার উভয় দিগেই বিপদ; বালকদিগকে শাসন করিলেও শিক্ষকের দোষ, না করিলেও দোষ। পতিত ভূমির ন্যায় শিক্ষক মহাশয় পড়িয়া আছেন, যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাও। কিন্তু গোড়াই যদি মাথা নষ্ট করিয়া ফেল, তবে শিক্ষকের ধর্ম্মতঃ কোনও দোষ নাই। আমরা জানি দুষ্ট বালককে শাসন করিতে গিয়া অনেক শিক্ষক নিতান্ত লাঞ্ছনাও ভোগ করিয়াছেন। অভিভাবকগণের একটু সুবিবেচক হওয়াই কর্ত্তব্য। বালকদিগকে বিলাসী করা কিম্বা বিলাসিতার উপকরণ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। আমাদের মতে দুষ্ট প্রকৃতির বালকদের হাতে একটী পয়সাও দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—আবশ্যকীয় জিনিষ কিনিয়া দেওয়াই উচিত। তাহা হইলে আর পুথির টাকা অপপথে ব্যয়িত হইতে পারে না; কিম্বা বেতনের পয়সাও চুরট সিগারেটে শোষন করিয়া নিতে পারে না।

বালকদিগের প্রতি ভালবাসা থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে ভালবাসা দ্বারা বালকদিগের নৈতিক জীবন, কর্ম্ম জীবন, ধর্ম্ম জীবন বিষময় হইয়া পড়ে সে ভালবাসাকে কি বলিব? আমি এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য কোন শব্দ তালাসে পাইলাম না। শত্রুতা নিবন্ধন লোকে বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগ করে; সেও বরং ভাল—যথন তথন যাহা কিছু হইয়া যায়। কিন্তু এই ভালবাসার বিষ সারাজীবন পূর্ণমাত্রায় কাজ চালাইতে থাকে। এই ভালবাসা বা আব্দার কেবল শিক্ষা পথের কণ্টক নহে; আব্দারের চোটে শারীরিক অনিষ্ট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নিতান্ত ছোট শিশুগুলির

বেশভূষা দেখিলেই এ ভাবটা বেশ বুঝা যায়। সাজ-পোষাকের আড়ম্বরে কোমলকায় শিশুগুলিকে একবারে "ভূত" সাজাইয়া ফেলে। "পেনিফ্রগ, নেকায় বোকার, কোট পেণ্ট, হ্যাট টুপী প্রভৃতি দ্বারা আদরের নিধি-দিগকে, "ক্ষুদ্রপদ চীনদেশীয় রমণীদিগের মত, অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। "বাবুর ছেলে, কর্ত্তার মেয়ে ;" এইরূপ ভাবে না সাজাইলে বিশেষত্ব রক্ষা পায় না কি ? এপ্রকার সাজ সজ্জার দরুণ স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না। উন্মুক্ত বায়ুর গতিরোধ করিয়া শিশুদের স্বাস্থ্যহানি সংঘটন করা কর্ত্তব্য কি ? শিশুগুলি হাত পা নাড়াচাড়া করিয়া, এদিগ ওদিগ ছুটাছুটি করিয়া প্রকৃতির ইঙ্গিতে শারীরিক বল সঞ্চয় এবং স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। তাহাদের সে চেষ্টায় বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য কি ? ইহাতে যে প্রকৃতির সঙ্গে ভয়ঙ্কর দ্বন্দ বাঁধে। পেনিফ্রগ-সজ্জিত শিশুগুলির প্রতি একটু নিবিষ্টচিত্তে দৃষ্টি করিলেই তাহাদের প্রকৃতি-বিরোধ-দ্বন্দ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ধনীলোকের টাকা আছে তাই তাহারা ওরূপভাবে আদর দেখায়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরিব লোকগুলিও মারা পড়ে। সমাজের অনেকেই এখন "তালে নাচে।" পয়সা জুটুক আর নাই জুটুক ছেলেদের জন্য "পেনিফ্রগ" আর ওদিগের "সেমিজ বডি"—এ গুলি এখন নিত্য খরচের অন্তর্ভুক্ত। এ সব না হলে কি চলে ? গিন্নী ঠাকুরাণীর এক তরকা ডিক্রিতে জবাব দেওয়ার সময় কৈ ? এই প্রকার অসঙ্গত আব্দার ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর বিলাসিতার আমদানি করে। লিখা পরা হউক আর নাই হউক সাজ সজ্জার চোটে কিন্তু চতুর্দ্দিগে বাহার পড়িয়া যায়। আমাদের মতে ছাত্র জীবনে এই সকল কমাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—ময় জুতা সার্ট।

(ঘ) অভিভাবকের উদাসিনতা। বালকগণ বিদ্যালয়ে যায় বটে কিন্তু কতটা কাজ করে সে খবর অভিভাবক মাত্রই রাখে না ; বৎসরান্তে হয়ত অনুগ্রহ করিয়া জানিল যে ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। দোষ

কাহার ? ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষক ছাত্রে পাঁচ ঘণ্টার সম্বন্ধ, আর অবশিষ্ট ১৯ ঘণ্টার খবর কাহার রাখা কর্ত্তব্য ? ওটা অভিভাবকের বণ্টকে নয় কি ? একটা বাৎসরিক হিসাব ধরুন। ৩৬৫ দিনের ভিতর বন্ধ, রবিবার, হাফস্কুল প্রভৃতিতে অন্যুন ১৬৫ দিন বাদ পড়ে। অবশিষ্ট ২০০ দিনে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা হিসাবে বৎসরে ১০০০ ঘণ্টা অর্থাৎ প্রায় ৪২ দিন মাত্র শিক্ষক ছাত্রে সম্বন্ধ। বাকী ৩২৩ দিনের খবর রাখা অভিভাবকের কর্ত্তব্য নয় কি? ৩২৩ দিন যাহার অলক্ষিত ভাবে; অসাবধানে ব্যায়িত হয়, ৪২ দিনের স্থব্যবহারে তাহার কি প্রতিকার হইতে পারে ? অবশ্য সৎপ্রকৃতির ছাত্রগণ ৪২ দিনের স্থশিক্ষা দ্বারা ৩২৩ দিনকে নিজেরাই সৎভাবে ব্যয় করিতে পারে ; কিন্তু যাহাদের সে ক্ষমতা নাই তাহাদের পক্ষে ৪২ দিন তো ফাও বাবদই চলিয়া যায়। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ের নাম করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয় কিন্তু পথে যাইয়া পথ হারাইয়া নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করতঃ বাড়ী ফিরিয়া আসে। অভিভাবকের অনুমতি বা কোন কাজের অজুহাত দর্শাইয়াও মাঝে মাঝে বিদ্যালয় হইতে চম্পট দেয়। এই প্রকার নানা কারণে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। অথচ শিক্ষক এবং অভিভাবকের মধ্যে কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ না থাকা হেতু ছেলেদের ছলচাতুরী ধরাও পরে না, প্রতিকারও হয় না। অভিভাবক যদি ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া বালকদিগের হিতার্থে শিক্ষকের সহিত একটা সম্বন্ধ রাখে তাহা হইলে ছাত্র অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। অভিভাবক যদি সামান্য একটু পরিশ্রম করে তাহা হইলেই অনেক মঙ্গল হইতে পারে। বালকদের প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখা অভিভাবকের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা এক জায়গায় একটা নূতন নিয়ম করিয়াছিলাম—নিম্নে তাহার নমুনা দিলাম :—

অমুক ছাত্রের দৈনিক বিবরণী।

তারিখ	সাহিত্য	অঙ্ক	ইতিহাস ভূগোল	ইংরাজী	সংস্কৃত	শিক্ষকের দস্তখত	অভিভাবকের দস্তখত
১ লা কার্ত্তিক	ভাল না	ভাল	শিখে নাই	ভাল না	মন্দ নয়	শ্রী —	শ্রী —
২ রা কার্ত্তিক						শ্রী —	
৩ রা কার্ত্তিক							

এই প্রকার একটা বন্দোবস্ত করিয়া বালকদের দৈনিক, সাপ্তাহিক কিম্বা মাসিক কাজের একটা হিসাব নেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি? দুঃখের সহিত বলিতে হইল সারকুলারের ধারায় ধরে নাই বলিয়া আমাদের এই নিয়মটা খাটিল না। অনেক অভিভাবকও তাহাতে নারাজ হইলেন— তাঁহারা দেখিলেন "ওটা প্রেকৃটিকেল বা কার্য্যকারী নহে"; আর আমরা বুঝিলাম অভিভাবকগণ—উদাসীন !!

(ঙ) কুসংসর্গ, কুবিষয়ের অলোচনা, কুৎসিত আমোদ প্রমোদ। অভিভাবকগণের উদাসীনতা হইতেই অধিকাংশ স্থলে ছাত্রগণ কুপথের অনুসরণ করে। বালকের প্রধান সঙ্গী অভিভাবকেরই হওয়া কর্ত্তব্য। সৎ আদর্শ পাইলে কেহ অসৎ পথ অবলম্বন করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

(চ) গৃহ শিক্ষার অভাব। গৃহ শিক্ষার কথায় কেহ মনে করিবেন না যে ঘরে ঘরে শিক্ষক রাখিবার কথা আমি বলিতেছি। গৃহশিক্ষার প্রসঙ্গে আমি কিছু বাহুল্য কথা বলিব। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি পুস্তক পড়িলেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এমন নহে। মানষিক শক্তির বিকাশ, বুদ্ধি বিবেচনার চালনা, মানষিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, চরিত্র সংগঠন প্রভৃতিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কেবল পুস্তক পাঠে, অথবা নির্দ্দিষ্ট পুস্তক অধ্যয়নে শিক্ষার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি? এজন্য বাহিরের পুথি পুস্তক পড়িতে হয়, সংসারের বাজে খবর রাখিতে হয়, সৎপ্রসঙ্গ সদালোচনা সৎ চিন্তা করিতে হয়। এই ধরনের শিক্ষা অনেকটা মুখে মুখে, শুনিতে শুনিতে, হইয়া থাকে। অনেক নিরক্ষর লোকের মুখে অনেক উচ্চ অঙ্গের কথা সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়। এক সাহেব, কৃষকদিগের মুখে, বহু দিনের পুরাতন কথা, বেদের গান শুনিয়াছিলেন, গঙ্গাপার হওয়ার বেলায় মাঝিদের গানে রামায়ণের

এবং মহাভারতের কাহিনী শিখিয়াছিলেন। কিন্তু "তে হি নো দিবসা গতাঃ"। এইক্ষণ তেমন ধারা শিক্ষা নাই। পূর্ব্বে "ঠারিন দিদিরা" নাতি নাতিনকে নিয়ে এসব সৎবিষয়ের আলোচনা করিতেন, উপদেশ পূর্ণ গল্প বলিয়া ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠন করিতেন; কড়াকিয়া, শতাভাগ, নামতা, "নামশ্লোক" প্রভৃতি শিখাইতেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ঘুম হইতে উঠিবার সময় দেবদেবীর নমস্কার, "দশমহাবিদ্যার নাম" পাঠ করিতে হইত। বিছানায় শুইয়া ঘুম আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সব "তন্ত্র মন্ত্র" অভ্যাস করিবার নিয়মও ছিল। যেমন মৌখিক শিক্ষা ছিল, তেমন মৌখিক পরীক্ষাও ছিল। নিমন্ত্রণের সভা, বিবাহের আসর, সাধারণ বৈঠক প্রভৃতিই এই মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। কেন্দ্র পরীক্ষায় উত্তর দিতে না পারিলে বড়ই লজ্জা পাইতে হইত। কেন্দ্র পরীক্ষায় না গেলেও দোষ ছিল; ঠারিন দিদি, মা, মাসী, পিসী প্রভৃতি মেয়ে মহলে এ জন্য ভয়ানক তাড়না হইত। কারণ তাঁহারা জানিতেন "পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার না করিলে চক্ষু ফুটে না"। কেন্দ্র হইতে ফিরিয়া আসিলে, "কি প্রশ্ন হইল, কি উত্তর হইল, তুই পারিলি কিনা" ইত্যাকার বেশ একটা নির্কাশ নেওয়া হইত। কেবল নিমন্ত্রন ভোজনই পূর্ব্বে উদ্দেশ্য ছিল না। এখনও দু এক জন প্রাচীনা স্ত্রীলোকের মুখে শুনা যায় "তোর নাম গোত্র কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল কি?" তুই উত্তর দিতে পারিলি কি? কিন্তু এখন সে সকল কথা কে পাতে লয়? নব্য শিক্ষিত বালকগণ হয়ত "নো" বলিয়াইবা এক গদ ছাড়িয়া দিলেন, বৃদ্ধাও বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়েন। পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, বিবাহ সভায় "বুড়ায় বুড়ায়" "যুবায় যুবায়" বালকে বালকে শাস্ত্রীয় আলোচনার বেশ একটা পাল্‌টা পাল্‌টী হইত। তাহাতে যে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইত, সদ্‌জ্ঞান বৃদ্ধি পাইত, একথা

কে অস্বীকার করিবেন? আশাকরি বর্ত্তমান অবস্থাটা সকলেই ভাবিয়া দেখিবেন। পাঁচজন একত্র হইলেই দলাদলীর প্রসঙ্গ, মামলা মোকর্দ্দমার কথাবার্ত্তা, না হয়, তাস, পাশা, দপা!! নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কথার মাড়ামারী খুব বেশী হয় সত্য—কে আগে কে পাছে বসিবে, কে কত দক্ষিণা পাবে, কত বিদায় পাবে, কাহার ইজ্জত রহিল, কাহার ইজ্জত গেল ইত্যাদি কথার মিমাংসা করিতেই দিন শেষ—হয়ত শেষ মিমাংসা কিছুই হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সকল নিয়া সর্ব্বদাই গণ্ডগোল হয় কিন্তু কেহই কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আবদ্ধ হয় না। নিয়মগুলি নির্দ্দিষ্ট থাকিলে সমাজের অনেক মঙ্গল হইতে পারে। এই সকল সভায় সৎপ্রসঙ্গ, সৎকথা যদি বা কেহ উঠাইতে চায় তবে সে বেচারার উপায় নাই, উপহাস, ঠাট্টা, কুব্যাখ্যা, নিন্দা চতুর্দ্দিক হইতে আরম্ভ হয়। আলোচক বেচারা অবাক! মাথা সামলাইয়া চলাই তাহার পক্ষে দায় হইয়া উঠে। ভূতের কাছে রামায়ণ কি ভাললাগে? অবশ্য সব স্থলেই যে এপ্রকার হয় তাহা নহে—মাঝে মাঝে বিজ্ঞলোকও উপস্থিত থাকেন। তাঁহারা সদালোচনা ভিন্ন প্রায়ই করেন না, লোকদিগকে বেশ উপদেশও দিয়া থাকেন। একস্থানে হয়ত রামায়ণের প্রসঙ্গ উঠিল, মনে করুন—রামের বনগমন—রাম বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এই যুদ্ধের সুচনা হয়ত মণিরামের মাতৃশ্রাদ্ধের সহিত মিশিয়া শেষটা "আজকাল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, কেহই পয়সা দিতে চাহে না" এই প্রকার উপসংহারে "রামের বনগমন" শেষ। এদিগে কিন্তু শ্রোতাদিগের অনুপায়—রামের বনগমনের কি হইল কে বলে? এই সকল বিজ্ঞ সভার আরও একটু বিবরণ না দিয়ে পারিলাম না। কোথাও একটা প্রশ্ন উঠিল "গয়াশ্রাদ্ধের

পর, তিথি শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা কি? উত্তর দায়কের অভাব নাই। সভাস্থ সকলেইউদগ্রীব হইয়া প্রশ্নের মিমাংসা করিতে আরম্ভ করেন—সকলেই ব্যস্ত—কে আগে বলিবে—মুখের কাজ সকলেই খুব দ্রুত গতিতে চালাইতে থাকেন—শেষে বক্তার দল এত বৃদ্ধি পায় যে শ্রোতারই অভাব হইয়া উঠে। এ দৃশ্যটা মন্দ নয়—একটা ভয়ানক হট্টগোল—প্রায় মাছের হাটের মতন। প্রশ্নের উত্তর হয়ত নঙ্ পূর্ব্বকাং। পথে যাইয়া সমালোচনা শুনুন, বেটা "আহাম্মক—কি একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিল; ঠিক উত্তরটা আমিই দিয়াছি।" যাহার সঙ্গেই আলাপ করুন, শুনিবেন "ঠিক কথা আমিই বলিয়াছি।" আমরা মনে করি এই প্রকার আলোচনা একদিগে যেমন কুশিক্ষার ফল অপর দিগে সুশিক্ষার ভয়ানক গতিরোধক, বায়ুরও বৃদ্ধিকারক, সংযম শিক্ষারও অনিষ্ট জনক।

বিবাহ আসরের কথাটাও একটু বলি—মাঝে মাঝে দু একটা তামাসা দেখা অন্যায় কি? আমরা জানি পূর্ব্বে বিবাহ সভায় বেশ লেখা পড়ার চর্চ্চা হইত। এখন কিন্তু সে সব নিয়ম থাটে না। বর পক্ষ আসিলেই সাধা সাধির ধুম পড়িয়া যায়। বাসায় যাওয়ার অনুরোধ পড়িলেই "ঠেস" আরম্ভ হয়; চুপি চুপি পরামর্শ!! গুপ্ত পরামর্শে কি সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহা জানা যায় না সত্য, কিন্তু মান অভিমানের গন্ধটা বেশ পাওয়া যায়। বর-যাত্রিগণ খাইবেন কিনা এই উত্তর পাইতেই হয়ত রাত্রিভোর—শেষে ভোরের বেলায় কাকের মত বাসা ছাড়িয়া প্রস্থান। "জামাই বাবুকে" বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই—স্থান বিশেষে এতৎসম্বন্ধে পূর্ব্বেই নিষেধাজ্ঞা জারী হয়, কারণ জামাই বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই নাকি তাহার অসম্মান করা হয়। বরযাত্রীদিগের সম্বন্ধেও এই ধারা প্রযুজ্য। কি হইলে যে বর এবং যাত্রীদের সম্মান রক্ষা পায় আমরা

তাহার ওজনটা বুঝিলাম না। যাহা হউক এ সকল নূতন "কাণ্ড কীর্ত্তণ" যে ভয়ঙ্কর অনিষ্টদায়ক, বোধহয়, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা একটু বিশেষ করিয়া বলি এই সব সুযোগে যে শিক্ষা লাভ হইত, আমাদের সামাজিক কুরীতি কুনীতি অনুসারে, তাহার গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

আমি পূর্ব্বে যে গৃহ শিক্ষার কথা বলিয়াছি তাহার নমুনা দেখাইবার জন্যই আমি এতগুলি অতিরিক্ত কথা বলিলাম। আশা করি আপনারা আমার এই বাচালতা দোষটা মাপ করিবেন। গৃহশিক্ষাই বলুন আর যাই বলুন সুযোগ অনুসারে শিক্ষার কার্য্য সমাধান করা কিম্বা শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য কি না তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার নিবেদন "উশুলের দণ্ড নাই।"

(ছ) শিক্ষকদিগের দুর্দ্দশা। শিক্ষকের প্রতি পূর্ব্বে যেমন শ্রদ্ধাভক্তি ছিল এখন তেমন নাই। বর্ত্তমান সময় শিক্ষক সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র। এই ধারণা অভিভাবক এবং ছাত্র উভয়ের মনেই বেশ দৃঢ় হইতেছে। অনেক স্থলে দেখা যায় অভিভাবক সামান্য বেতনভোগী শিক্ষক মহাশয়কে বসিতেও বলেন না। অভিভাবক হইতে ছাত্রও এই কুনীতি কুব্যবহার শিখিয়া থাকে। অভিভাবকদের মনে রাখা উচিত যে শিক্ষক সামান্য বেতন পাইলেও তিনি মানুষ তৈয়ার করেন, তিনি জগতের শিক্ষক, তাঁহার সম্মান খুব বেশী হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময় শিক্ষকের উপর কর্ত্তার অভাব নাই, কিন্তু বেতনের মাত্রা অতি সামান্য। তাই শিক্ষকও চঞ্চলমতি হইয়া পড়েন। অবসর মত যাহা কিছু পাইল তজ্জন্যই চাকুরী গ্রহণ, মন কিন্তু বিষয়ান্তরে সর্ব্বদাই ছুটাছুটী করে। এই সমস্ত কারণে শিক্ষক ছাত্রে কোন নিকট সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না; শিক্ষাকার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না।

সংস্কৃত শিক্ষা ।

আমি উপরে যে কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিলাম তাহা কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে যে খাটে এমন নহে; অপরাপর সম্প্রদায়ের জন্যও ঐ কারণগুলি উল্লেখ যোগ্য। এইক্ষণ আমি আমাদের খাস সংস্কৃত শিক্ষার কথা বলিব। হিন্দুশাস্ত্র শিখিতে হইলে, বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপত্তি থাকা একান্ত আবশ্যক ইহা বলাই নিস্প্রয়োজন। এই ভাষার নাম "সংস্কৃত ভাষা"—বিষয়টা কি রকম, কে কি প্রকার অর্থ করেন জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ভাষাদ্বারা সংস্কার কার্য্যসিদ্ধ হয় তাহাই "সংস্কৃত ভাষা"। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত "সংস্কার" গুলি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ফলপ্রদ হইতে পারে না সময়ান্তরে এতৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব বলিয়া আশা রহিল। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্কার হওয়া না হওয়া একই কথা। সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা স্বধু ব্রাহ্মণের নহে, হিন্দু মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। এমন বিশুদ্ধ দেবভাষা আমাদের সমাজে অনাদৃত হইতেছে; কিন্তু জার্ম্মেনীতে কৃষকরা পর্য্যন্ত এই ভাষা শিক্ষা করিতেছে—ভায়ারা সজাগ আছেন তো !!

হিন্দু শাস্ত্রালোচনা কিম্বা সংস্কৃতভাষা অভ্যাস করা সম্বন্ধে অনেক মহাত্মার মুখে অনেক আজকবী যুক্তি শুনা যায়। কেহ বলেন সংস্কৃতশিক্ষায় কোন ফলোদয় নাই, শাস্ত্রালোচনাতে কোন লাভ নাই, কারণ "ইহাতে অর্থাগম হয় না, চাকুরীও মিলেনা; যজমান শিষ্যেরাও পয়সা দিতে চাহে না।" কোন কোন বিদ্যাধর বলিয়া থাকেন—"কায়স্থ-গণ এখন শাস্ত্র মানে না, পয়সাও দেয় না"—এই প্রকার উক্তি যে ভ্রান্ত স্বধু তাহাই নহে বরঞ্চ মিথ্যা কথা বলিয়াই আমি মনে করি।

এই দুঃখদারিদ্র্য পূর্ণ সংসারে এখনও "দশরা, বার্ষিক, বিদায়, দক্ষিণা" প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। "অনুপযুক্ত সর্ব্বাধিকারীর" কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল—উপযুক্ত ব্যক্তির আদর এদেশে খুব আছে। একদিকে যেমন "শক্তি অনুসারে ভক্তি," অপরদিগে তেমন "দেবতার অনুরূপ নৈবেদ্য"—কথাগুলি সর্ব্বসম্মত নয় কি? ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুড়াই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? যজমানি কিম্বা গুরুতা কার্য্য সম্পাদনের জন্য একটু "টঁটাটিটী" শিক্ষা করিলেই হইল—শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য কি এতই ক্ষুদ্র? নিজের সন্ধ্যা পূজাতে কি শাস্ত্রীয় জ্ঞানের দরকার নাই? অর্থবোধ না থাকিলে, ভাব না বুঝিলে সুধু মুখস্থ বিদ্যায় কি কোন ফল হয়?

রাজকীয় অনুগ্রহে আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার বেশ হইতেছে। অধুনা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াও শিক্ষার পথ অধিকতর সুগম হইয়া পড়িতেছে। এ সব বিষয়ে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু নাই। কিন্তু খাস সংস্কৃত শিক্ষার জন্য "টোল, চতুষ্পাটি" স্থাপন আমাদের দেশে প্রাচীনতম প্রথা। এই টোলগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। অবৈতনিক ভাবে বিদ্যাদান করা যে একটী বিশেষ ধর্ম্মকর্ম্ম ইহা, বোধ হয়, ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশের লোক জানে না। ভারতের এই ধর্ম্মবুদ্ধি এখনও অনেক জাতি ধারণাতে আনিতে পারে নাই। সুধু বিদ্যাদান নহে—সঙ্গে সঙ্গে অন্নদানও। ঈদৃশ মহৎ উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য আর কোন দেশে আছে কি? বড় কাজ সংসারে অনেকেই করিয়া থাকে কিন্তু ক্ষুদ্র কাজ কয়জনে করে? বরং ক্ষুদ্র কাজ করা যতটা আয়াসসাধ্য, বড় কাজ তত কষ্টকর নহে।

বর্ত্তমান সময় এই ক্ষুদ্র ধরণের মহৎ অনুষ্ঠানগুলির বড়ই দুর্দ্দশা!! টোলগুলি প্রায়ই অধ্যাপকের যত্ন চেষ্টায় চালিত। সে সম্বন্ধে অপরাপর

লোক কোন খবরই রাখেন না। যত্তপি কেহ খবর রাখেন সেও "না মারি মাছ, না ছুই পানীয়" মত হইয়া পড়ে। অধ্যাপকদিগকে টোল নিয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। নিজের অন্ন সংস্থান করিয়া দু একটী ছাত্রের বাসাও দিতে হয়। ছাত্রের সুবিধা করিবার জন্য অধ্যাপক মহাশয়কে গ্রামবাসী অপরাপর লোকের তোষামোদও করিতে হয়। কিন্তু "পরিবর্ত্তিনি সংসারে" অবস্থার পরিবর্ত্তনে সকলেই অন্নচিন্তায় জড়সর। মাঝে মাঝে দু একজন ধনী লোক আছেন বটে কিন্তু তাহাদের হাহাকার গরিবদের অপেক্ষা অনেক বেশী। পূর্ব্বে রাজা বা ধনী লোকেরা টোলের জন্য নানা উপায়ে এমন অর্থ সাহায্য করিতেন যে অধ্যাপক অনন্যমনে অধ্যাপনার কার্য্যেই রত থাকিতে পারিতেন; এখন কিন্তু অধ্যপকের সে সুবিধা নাই। অর্থচিন্তা মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। কাজেই অধ্যাপনার কার্য্যে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে!! টোলগুলির অবস্থা কিসে ভাল হইতে পারে সমাজের সকলেরই সে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

টোলের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যা। বাস্তবিক টোলের শিক্ষানীতি বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্যকারীই নহে। অধিকাংশ স্থলেই সুধু ব্যাকরণ নিয়া মারামারী। আশ্চর্য্যের কথা আমাদের এ দেশে সাহিত্যের একটী টোলও নাই। সুধু ব্যাকরণ শিক্ষা যে জ্ঞানোদয়ের অনুকূল নহে একথা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। ভাষা সুন্দরীর অঙ্গ-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনার্থ অলঙ্কার নির্ম্মাতা স্বর্ণকারই ব্যাকরণ। সুন্দরীর সঙ্গে দেখা শুনা নাই—স্বর্ণকারের অলঙ্কারে কি দরকার? সাহিত্যের সঙ্গে যোগ না থাকিলে সুধু ব্যাকরণে কোন ফল হয় কি? রূপ ঠিক না করিয়া ধ্যান করা যেমন নিরর্থক, মানচিত্র ব্যতীত ভূগোল শিক্ষা যেমন অসম্ভব, গান ব্যতীত তাল রাগিনী যেমন বৃথা, সাহিত্য

ব্যতীত ব্যাকরণ শিক্ষাও তেমন কিছুই নহে। যে ভাবে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই বরং বেশী হয়। বুঝিবার শক্তি, ধারণা শক্তি, কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি, প্রভৃতি গুণগুলিকে বরঞ্চ মূলেই নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। অন্য প্রকার নীতি শিক্ষার কথা ধরিলাম না। ব্যাকরণের "ফাকি" শিখিতে শিখিতে জীবনের মূল্যবান অংশটা ফাকেই পড়িয়া যায়। শেষে এই ফাকি নৈতিকজীবনে, কর্ম্মজীবনে, ধর্ম্মজীবনে বেশ ক্রিয়া করিতে থাকে। অন্যান্য বিষয় শিখিতে সময় কোথায়? একটী কলসীতে দশসের চাউল ধরে, আপনি যদি বল প্রয়োগে সে কলসীতে পনর সের চাউল ভরিতে চেষ্টা করেন তবে উহা ভাঙ্গিবে না কি? আধ পোয়া দুগ্ধে যে শিশুর ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহাকে একপোয়া দুগ্ধ খাওয়াইলে কি ফল হইবে, হয়ত বমি নয়ত বিষুচিকা। যে বালক পাটীগণিতের সামান্য ভাগের অঙ্ক মাত্র করিতে পারে তাহাকে বীজ-গণিতের সমীকরণ শিক্ষা দিলে কি রকম হয়? তোতা পাখীর মত হয়ত সে এক দফা নিয়ম মুখস্থ করিয়া নিল; কিন্তু তাহাতে তাহার শক্তি বৃদ্ধি পাইল কি? বরং মস্তিষ্কটা খারাপই করা হইল। ব্যাকরণ শিক্ষার কি রকম ফল হয় তাহা বুঝাইবার জন্য আমি এই কথাগুলি বলিলাম। টোলের শিক্ষা পদ্ধতি আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে আমাদের সমাজের মঙ্গল নাই।

নানা প্রকার অভাব অভিযোগবশতঃ, বিবিধ রকমের বিশৃঙ্খলতা প্রযুক্ত টোলের প্রতি এখন অনেকেরই অনাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকের মতে "টোলগুলি উঠিয়া যাওয়াই সঙ্গত"। এই বিষয়ে আমি তাহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। টোলগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ—হিন্দু সভ্যতার ভগ্ন মন্দির—সনাতন ধর্ম্ম শিক্ষার প্রথম কেন্দ্র স্থান, হিন্দু ধার্ম্মিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই

গুলিকে দূরে সরাইয়া দিলে মঙ্গল হইবে কি? বরং উপযুক্তরূপে চালাইতে পারিলেই সুফল ফলিবে। রুগ্ন পুত্রকে কেহ কি ঘৃণা করে? বরং রোগমুক্ত করিয়া তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেই মাতাপিতা বন্ধু বান্ধবগণ চেষ্টা করে। যে যাহাকে ভালবাসে সেই তাহার দোষ দেখে। টোলের কর্ত্তাদেরও বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের সমাজে জ্ঞানের তৃষ্ণা একবারে নাই বলিলেই হয়। পুস্তকাদি খরিদ করিয়া টাকা পয়সা ব্যয় করাও অনেকের মতে অপব্যয়ের মধ্যে পরিগণিত!! শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা চর্চ্চায় প্রায়ই পূর্ণ বিচ্ছেদ পড়িয়া যায়। ব্যবসায়ানুযায়ী যতটা শিক্ষার দরকার কোন প্রকারে ততদূর অগ্রসর হইতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবারণ হইল। ব্যবসায়ের জন্যও যে বহির্জগতের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, "বাজে পুস্তক" পড়া নিতান্ত দরকার ইহাও অনেকে বুঝেন না—ফলে লব্ধ বিদ্যাও লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। বিবিধ প্রকারের গ্রন্থপুস্তকসংবাদপত্রিকাদিঅধ্যয়ন করিলে যে কত জ্ঞান জন্মে আমাদের এতদ্দেশীয় লোক তাহা জানে না। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অধ্যয়ন জন্য দৈনিক দুই এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করা কর্ত্তব্য। দিনে এক ঘণ্টা করিয়া পড়িলে আর এক ঘণ্টা করিয়া চিন্তা করিলে বৎসরে কতটা কাজ হইতে পারে আশা করি দু এক জনে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কাহারও কাহারও নাকি সময়েই কুলায় না। গ্রাম্য লোকদের মুখেই এই কথাটা বেশী মাত্রায় শুনা যায়। আমরা বুঝি না ইহাদের সময় কিসে যায়। কাহারও সময়ে কুলায় না," "কাহারও সময় যায় না"—কাজ কিন্তু সমানই হইয়া থাকে। সময়ের অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিরা যে কাজ বেশী করে আমাদের এমন বিশ্বাস হয় না। সত্য বটে ইহারা "বাজে মার্কার" কাজ কিছু বেশী করে যাহা ঐহিক পারত্রিক কোন কালেরই উপকারী নহে। আমাদের শাস্ত্রের মতে ইহা

জীবনের চিন্তাভাবনা, জ্ঞান, সংস্কার, বুদ্ধি বিদ্যা পরবর্ত্তী জীবনেও প্রকাশিত হয়। জন্মান্তর বলিয়া যখন আমরা বিশ্বাস করি তখন আগামী জন্মের জন্য কতকটা কাজ ইহ জীবনে, অবসরমত, করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয় কি ? আমরা জানি জন্মান্তরের ফলানুসারে আত্মার উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে ইহ জীবনে যতটা জ্ঞান উপার্জ্জন করা যায় ততই তো ভাল ; আমাদের বাজে কাজটা কমাইয়া ভবিষ্যতের দিগে একটু ঝুঁকি রাখা কর্ত্তব্য নয় কি ?

বর্ত্তমান সময় সমাজে জ্ঞানের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমি পূর্ব্বে যে " গৃহশিক্ষার " কথা বলিয়াছি তাহার প্রচলন বাঞ্ছণীয়। বাজে পুঁথি পুস্তক যাহাতে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই পড়ে এমন একটা " ঠেকাঠেকি " নিয়ম করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রীয় আলোচনার যাহাতে বৃদ্ধি হয় তৎপ্রতি আমি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষন করি। আমি শুধু কলাপ বা পাণিনির কথা, হিতোপদেশ বা রঘুবংশের কথা, বলি নাই। হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল উচ্চ আদর্শ, আছে, যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রহিয়াছে, যে শিল্পনৈপুন্য, অথনীতি, ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি, আধ্যাত্মতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব রহিয়াছে, যাহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য বিদেশীয়দিগের চিত্তকে ক্রমশঃই দৃঢ়তরভাবে আকর্ষন করিতেছে—আমি সেই সকলের কথাই, বলিতেছি। সমাজের লক্ষ ক্রমশঃ নীচের দিগে না যাইয়া উপরের দিগে উঠুক্ ইহাই আমার ঐকান্তিক বাসনা। মানষিক বৃত্তিগুলির ক্রম বিকাশ জ্ঞানের বৃদ্ধিকারক, আর তাহাদের সঙ্কীর্ণতাই মুর্খতার উৎপাদক। সম্প্রতি আমি এবিষয়ে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না আপনাদের অনেক সময় কষ্ট করিয়াছি, বিশেষতঃ আমার আরও একটা বিষয় রহিয়াছে ! উপরোক্ত অবস্থানুসারে শিক্ষা সম্বন্ধে কিব্যবস্থা হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিতে অমি সভাকে অনুরোধ করিতেছি। এতৎ

সম্বন্ধে আমার মত এই যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটী "শিক্ষাসমিতি" গঠন করা কর্ত্তব্য। সমিতি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে কতক ফল অবশ্যই হইবে। অনেকে আর্থিক দুরবস্থার কথা ভবিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়েন। অর্থানুকুল্য ব্যতাত এসব কাজ হয় না সত্য কিন্তু শারীরিক খাটনী দ্বারা যতটা হইতে পারে তাহা বাদ পড়ে কেন? এখনও আমাদের দেশে অনেক জ্ঞানী লোক আছেন, অনেক নিঃস্বাথ উপদেষ্টা আছেন অনেক শাস্ত্রজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহাদের সংসর্গ, সংশ্রব, তাঁহাদের উপদেশাবলী আমরা পরিত্যাগ করি কেন? আমাদের স্বার্থের জন্য তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া নেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয় কি? হিন্দুসাস্ত্রের রহস্য বুঝিবার জন্য অনেকেরই এখন আগ্রহ দেখা যায়। ইহা খুব শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। অনেকের মুখেই শুনা যায়, "কেন শ্রাদ্ধ করিতে হবে, বিবাহের বৈজ্ঞানিকত্ব কি, দেবদেবীর পুজাকেনকরিতে হবে, সংকল্প প্রণালী কি" এই প্রকার নানা বিষয়ক প্রশ্নে তাহাদের অনুসন্ধান বৃত্তির প্রকাশ পায়। ইহা জ্ঞানতৃষ্ণার লক্ষণ নহে কি? এই সকল তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে উপদেশের জলদান নাকরা একান্ত অন্যায়। জলপাত্র বহন করিয়া জগতের তৃষ্ণা নিবারণ করাই এখন শাস্ত্রোপদেষ্টা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রেরদিকে সমগ্র জগতের যে প্রকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িতেছে তাহাতে, বোধ হয়, অতিশীঘ্রই হিন্দুশাস্ত্রের বিমল জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইবে। নদীতে ভাটার জোর কমিয়া আসিলেই জোয়ারের অন্তস্রোত আরম্ভ হয়। ধর্ম্মজগতে ভাটার শেষ পড়িয়াছে ভিতরে ভিতরে জোয়ারও আরম্ভ হইয়াছে শীঘ্রই জগৎ প্লাবিত হইবে।

অর্থাভাবজনিত নৈরাশ্য সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, "যার কাজ সেই করে, লোকে বলে আমি করি"। ভগবানের রাজ্যে কিছুরই

অভাব নাই। সদুদ্দেশ্যে অনেকেই অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভগবদিচ্ছা পূর্ণ না হইয়া পারে না। আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎকৃতিঃ
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ভবেৎ ক্রিয়া।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কৃষি শিল্প।

এইক্ষণ আমার তৃতীয় প্রস্তাব "অর্থাগম"। দেশের অর্থাভাব সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও চলে। আমাদের দেশীয় লোকের অর্থাভাব উপলব্ধি করিতে কিছু মাত্র যে বাকী আছে এমন বিশ্বাস হয় না। এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ জগতের অন্য কোন দেশে হয় না। বাহিরে যাহাকে যেভাবেই দেখা যাক না কেন, ভিতরটা অনেক লোকেরই অভাববিষে জর্জ্জরিত। "ঋণগ্রস্ত নয়," একথা ক্বচিৎ দুচার জন লোকের পক্ষে খাটে। যাই হউক কেবল অভাবের চিন্তা করিলে অভাব দূর হয় না, বরং তাহাতে অভাব বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "উপায়েন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যানি ন মনোরথৈঃ"। উপায় স্থির করিতে না পারিলে কোন কাজ হইতে পারে না। দেশে কি ভাবে অর্থাগম হইতে পারে তাহার উপায় স্থির করাই কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ কথায় বলে 'ব্যবসায় বাণিজ্য ব্যতীত অর্থাগম হয় না।" বাস্তবিক বাণিজ্যই দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। আমাদের দেশে

অন্তর্বাণিজ্য যথেষ্টই আছে। কিন্তু তাহাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না। সঞ্চিত অর্থ ব্যতীত বাণিজ্য হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই দরিদ্র। সুতরাং অর্থাগমের নূতন নূতন পথ আবিষ্কৃত না হইলে এই দরিদ্র দেশের উপায় নাই। তাই এ স্থলে অর্থাগম সম্বন্ধে আমি মাত্র দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিব (১) কৃষি (২) শিল্প।

(১) কৃষি। দু এক জন নিরক্ষর লোকের মুখে শুনা যায় "পয়সা জন্মে মাটিতে"। শিক্ষিত সমাজে এই কথাটা শোভা পায় কি না জানি না। কিন্তু কথাটী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম। বাস্তবিক কৃষিকার্য্য হইতেই প্রথমে টাকার আমদানী হয়। "টাকা দিয়া টাকা আনিতে" সঞ্চিত টাকার দরকার, কিন্তু "দু চার আঙ্গুল মাটী যে খুড়িতে পারে, সে বিনা টাকায়ই টাকা পায়।" কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য নয় কি? আমরা শুনিতে পাই আমেরিকা পৃথিবীর মধ্যে ধনে রত্নে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমেরিকাবাসীদের অর্থের কথা শুনিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। নিতান্ত দরিদ্র কুলিমজুরেরও সে দেশে জন প্রতি মাসিক অন্ততঃ একশত টাকা খরচ হয়। কি রকম আয় হইলে এই প্রকার খরচ হইতে পারে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকাবাসীদের এই প্রকার অপর্য্যাপ্ত অর্থাগমের মূল কারণ কৃষি। তাহারা প্রথমতঃই কৃষিকার্য্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে; কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য নানা প্রকার কলকৌশল আবিষ্কার করিয়া পরিশ্রমের লাঘব করিয়া নেয়। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করাতে অল্প সময়ে অধিক কাজ হয়, অপর্য্যাপ্ত ফসল প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার কৃষিকার্য্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া তৎপরে তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি আরম্ভ করে। উপযুক্ত মূলধন আর উপযুক্ত চালক হইলে

ব্যবসায় বানিজ্য বা কল কারখানার উন্নতি না হইয়া পারে না। এই স্থলে একটী কথা বলিয়া রাখি আমেরিকার কৃষকগণ আমাদের দেশীয় এম, এ, বিএ পাশের তুল্য বিদ্বান। সে দেশে যে ব্যক্তি মাসিক হাজার দুহাজার টাকা বেতনে কাজ করে সেও নিজের গাট্রি বোঝা, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিজেই বহন করিয়া নেয়। সে দেশে বার্ষিক যাহার ৪০।৫০ হাজার টাকা আয় সেও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করে। আর আমাদের দেশে—এড়ভোৎপি ক্রমায়তে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষিসম্বল লোকের সংখ্যাও আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশী। ভারতবর্ষে প্রায় বার আনা লোক কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি ভদ্র কি অভদ্র কাহারই কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্লে চেষ্টা নাই। সে যেভাবে চলিতেছে, সে সেভাবেই যাইতেছে যেমন "ভাটী গাঙ্গের নৌকা"—স্রোত ফিরিলে আর উপায় নাই "দাড় বৈঠা" বন্ধ করিয়া হয়ত এক জায়গায় "পাড়া" দিয়াই রহিল!! কত প্রকারে যে কৃষি নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। (১) অনাবৃষ্টি (২) অতিবৃষ্টি (৩) বন্যারজল (৪) ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস (৫) মেঘ সঞ্চার (৬) ইন্দুর বানর প্রভৃতির উপদ্রব (৭) পোকে ধরা (৮ শস্যগাছ লাল হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কত কারণে কৃষির সর্ব্বনাশ সাধন হইতেছে। এ সকলের প্রতিকারার্থ কোন চেষ্টা আছে কি? অনেকে বলেন "গিয়ে থুযে যা থাকে আনিলাম, আর করিব কি?" কথাটা অসার, অলসোক্তি বলিয়াই আমরা মনে করি। একবার যে কারণে কৃষিনাশ হয় ভবিষ্যতে যেন তাহা না ঘটিতে পারে এমন চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয় কি? "চেষ্টা কখনও বন্ধ্যা নহে।" আমাদের শাস্ত্রে আছে "ব্যাধি জন্মাইয়া পাছে, জন্মাইছে ঔষধ।" যে সকল

ব্যাংতে ক্রমিনাশ হয় তাহার নিবারণার্থ ঔষধও নিশ্চয়ই আছে। আমরা তালাস করিনা, তালাস করিতে জানি না, তাই ঔষধও পাই না। আমার মতে কৃষি কার্য্যের উন্নতি কল্পে একটী কৃষি সমিতি গঠন করা কর্ত্তব্য। এতৎ সম্বন্ধে এইক্ষণ বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। কৃষির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া উন্নত প্রণালীতে যাহাতে কৃষিকার্য্য হইতে পারে তাহা সাধারণ লোকদিগকে জানাইয়া দেওয়া এই সমিতির প্রথম কর্ত্তব্য কার্য্য হওয়া উচিত।

এইক্ষণ আমার অপর বিষয়। শিল্পোন্নতি সাধনার্থও আমার মতে একটী শিল্পসমিতি গঠন করা কর্ত্তব্য। শিল্পের কথা বলিলেই আমাদের দেশীয় লোক খুব বড় বড় কল কারখানার কথা মনে করে। অবশ্য বড় কলকারখানা করিবার ইচ্ছা এবং তত্ত্বানুসন্ধান প্রশংসনীয় সত্য, কিন্তু ক্ষুদ্র হইতেই বৃহতের সৃষ্টি। আমাদের দেশে আর্থিক অবস্থার হীনতা বশতঃ বড় কল প্রভৃতি করা কষ্টকর। বিশেষতঃ তাহাতে সাধারণ লোকের স্বার্থ লাভ খুব কমই হওয়ার কথা। সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণ জন্য তাহাদের স্বার্থের পথ উন্মুক্ত করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে অর্থবল যদ্যপি কম, লোকবল কম নহে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আমাদের দেশের ন্যায় এত বেশী সংখ্যক লোক অলস ভাবে সময় কর্ত্তন করে না। অকর্ম্মণ্য লোকগুলিকে যে কোন প্রকারের কার্য্যে ব্যাপৃত করিতে পারিলে দেশের পক্ষে যথেষ্ট উপকার হইবে। গ্রামদেশে বহুসংখ্যক লোক বিনা কাজে বসিয়া থাকে—অলসতার উপসনা করিতে করিতে একদিগে ইহারা যেমন নিজের অনিষ্ঠ করে অপরদিগে তেমন সমাজে কুৎসিত আদর্শ সৃষ্টি করিয়া সমাজের ঘোরতর অমঙ্গল সাধন করে। কিন্তু ইহাদিগকে যথোপযুক্ত কার্য্যে নিয়োজিত রাখিতে পারিলে যেমন অর্থাগম হইবে তেমনই সমাজের অনেক কণ্টক দূরীভূত হইবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রকমের শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অনেক লোক উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে চড়কার সূতা তৈয়ার করা ভদ্র মহিলাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। এখন তাহা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। অনেকে বলেন "চড়কা এখন আমাদের দেশে কার্য্যকারী হতে পারে না কারণ উহাতে নাকি কাহারও পোষায় না।" কথাটার সত্যতা আমি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যাহারা সারা জীবন অলসভাবে অতিবাহিত করে, যাহারা এক পয়সাও উপার্জ্জন করিতে পারে না তাহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করে তাহাই তো লাভ। একবারে কিছু না পাওয়া অপেক্ষা দৈনিক দু চার আনা রোজকার হইলে অসঙ্গত কি? এদেশে মহিলাদিগকে খুব কমই কাজ করিতে হয়। অবসর মত কাজ করিলে ইহারা যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে। সর্ব্বদা অলসভাবে বসিয়া থাকা অপেক্ষা কিছু কাজ করা কি লাভজনক নহে? মহিলাদিগের পক্ষে কেন যে চড়কার কাজে পোষায় না আমি বুঝি না। ইহারা চড়কায় কাজ করিলে অন্য কোন কাজের ক্ষতি হওয়ার তো কথা নাই। আমি আশা করি আমাদের নেতৃবর্গ এ বিষয়টা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আমি যে কেবল চড়কার জন্যই বলিতেছি এমন নহে। এমন অনেক কাজ আছে যাহা অল্পায়াসে অবসর মত করা যাইতে পারে অথচ তাহাতে কিছু কিছু অর্থাগমনেরও সম্ভাবনা। আমাদের দেশে আর্থিক অবস্থা যেমন শোচনীয় হইতেছে ইহাতে স্ত্রী পুরুষের সমভাবে কাজ করা কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক পরিবারের অন্ন সংস্থান হওয়া অসম্ভব। অনেক মহিলা বেশ ফিতা, টুপী, সূতা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অনেক কাজ আদায় করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ লেখা পরা শিক্ষার কিছুমাত্র দরকার হয় না;

এমন কি নিতান্ত মূর্খ লোক দ্বারাও এ সব কাজ হইতে পারে। কর্ম্ম করিলেই কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হয়; কর্ম্ম শক্তির বিকাশে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। কর্ম্ম করিবার প্রণালী দেশময় শিক্ষা দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্তব্য।

আমি ব্রাহ্মণ সভা উপলক্ষে অনেকগুলি কথা বলিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক ইহাতে বুঝা যায় আমি ব্রাহ্মণ সমাজকে একটু বিশেষ রমক "পাকড়াও" করিবার ইঙ্গিত করিতেছি। শুধু ইঙ্গিত নহে আমার ইচ্ছাও তদ্রূপ। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভারত প্রধান অলস দেশ, আর সমগ্র জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি প্রথম নম্বর নিষ্কর্ম্মা। বিনা কাজে অন্য কোন সমাজে এত অধিক সংখ্যক লোক অলস ভাবে বসিয়া থাকে না। ইহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করা একান্ত কর্ত্তব্য, অন্যথা দেশের পক্ষে মঙ্গল হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ইহা একটী বিস্তৃত ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়। ইহাদিগকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতে পারিলে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইবে। দেশে ইহাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে, ইহাদের অন্তরে ব্রহ্মতেজও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সেই তেজের বিকাশ আবশ্যক, নতুবা কোন কাজ হইতে পারে না।

এইক্ষণ আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম না। সামান্য কয়েকটী কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমরা অলসভাবে বসিয়া

কেবল পরামর্শ করিতেই সক্ষম, কার্য্যতঃ শক্তির পরিচালনা করিতে অনেক সময়ই আমরা পরাঙ্মুক। এইটি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দোষ। অলসতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নৈরাশ্যের বিভীষিকা, বাধাবিঘ্নের নিরর্থক ভীতি, শারীরিক জড়ত্বের অসারতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের সময় যতই অলসভাবে ব্যয়িত হইতেছে ততই আমাদের অবস্থাও শোচনীয় হইতেছে। আর সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। সময় অতিবাহিত না করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করাই উচিত।

দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য এইবারে আমি এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি পাইলে বারান্তরে আরও কিছু বলিব বলিয়া আশা রহিল। আমার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একখানা ছবি অঙ্কিত করিলাম।

— — —
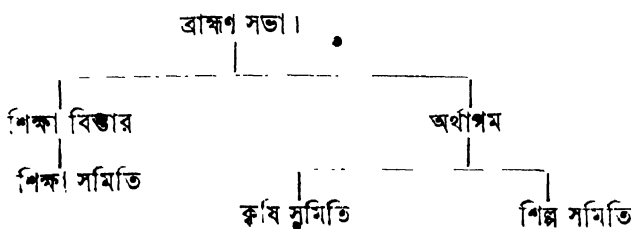
নবম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশের লোক গণনা।

দেশ এবং সমাজের কথা যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহারা জানেন যে হিন্দু সমাজের কি ভয়ঙ্কর অবনতি ঘটিয়াছে। হিন্দুর অবনতি যে কত বিষয়ে ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সহজনয়। সর্ব্ববিধ অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তৎপ্রতিকারার্থ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত; বিশেষতঃ এ প্রবন্ধে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইল কেন? হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধির কোন উপায় আছে কিনা? জানিনা ভগবানের ইচ্ছা কি প্রকার।

১৯০১ খৃঃ লোকগণনার তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় হিন্দুর সংখ্যা নিতান্ত শোচনীয় ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দূর সংখ্যা ৪ লক্ষ বেশী ছিল। কিন্তু উল্লিখিত বৎসরে দেখা গেল হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ২৬ লক্ষ বেশী। সুতরাং স্পষ্টতঃই প্রমাণ হইতেছে ৩০ বৎসরে মুসলমান সংখ্যা ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দূর এই প্রকার শোচনীয় অবনতি দর্শনে অনেক হৃদয়বান ব্যক্তিই চিন্তিত হইতেছেন। চিন্তার কথাও বটে। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কোন সহৃদয় ভাবুক লোক বলিয়াছেন "তার ফল পরে এই দাড়াইবে যে, হিন্দু হইতে মুসলমান সংখ্যা ক্রমে বাড়ীয়া পরে সংখ্যায় অধিক হইয়া পড়িবে।"

উদ্ধৃত বাক্যটীর ভাবার্থ আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে হিন্দুর কোন প্রকার আপত্তি আছে কিনা

জানি না ; কিম্বা এ প্রকার আপত্তি থাকা সঙ্গত কিনা তাহাও আমরা বুঝি না। ইহার ভিতরে কোন গুহ্যভাব যদি থাকিয়া থাকে তাহা জন সমাজে ব্যক্ত না হওয়াই আমরা ভাল মনে করি। আমরা মুসলমান সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি ইহাদের সংখ্যা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এ স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি মুসলমানের সংখ্যা যে খুব বেশী পরিমানে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে আমরা তাহা স্বীকার করি না। "ধন জন বৃদ্ধি হউক" ইহা কে না ইচ্ছা করে ? লোক সংখ্যা কত হইলে যে বৃদ্ধির সীমানা নির্দ্ধারিত হয় আমরা তাহা ঠিক ধারণা করিতে অক্ষম। আমরা এই মাত্র বুঝি লোক সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই ভাল। বিশেষতঃ দেশের হিসাবে ধরিতে গেলে "আমার ঘরে বাড়ুক, তার ঘরে কম হউক" এ প্রকার ইচ্ছা ভাল নহে। যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে মুসলমান সমাজেও লোকক্ষয়ের কতকগুলি কারণ আছে। সেই কারণগুলি দূর করিতে চেষ্টা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহাদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই কথা বলিলাম বলিয়া কেহ যেন আমাদের প্রতি রাগ না করেন ইহাই প্রার্থনা।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। তবে আমরা এইমাত্র দেখিব যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কিনা ? লোক সংখ্যা সম্বন্ধে দেশগত উন্নতির দিগে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু দেশগত ভাবে ধরিতে গেলে সামাজিক হ্রাসবৃদ্ধি ঠিক করা অসম্ভব। সুতরাং এ স্থলে আমরা সামাজিক ভাবে হিসাব ধরিব। তাহার বিশেষ কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হিন্দুর সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা।

আমার তহবিলে ৫ বৎসর পূর্ব্বে ৫০০০ টাকা ছিল। আমার প্রাত্যহিক আয় ১৬৲ টাকা কিন্তু খরচ ১৫৲ টাকা। আমার এক বন্ধুর তহবিলে ঠিক সেই সময়ে ছিল ৪০০০৲। কিন্তু তাহার দৈনিক আয় ৫০৲ টাকা খরচও ৪০৲। ইত্যাকার দুই তহবিলের ৫ বৎসরের হিসাব ধরিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে ৫ বৎসরে আমার তহবিল অপেক্ষা তাহার তহবিলে ৮০০৲ টাকা বেশী হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে, তহবিলের টাকা যদি কেবল গচ্ছিতই থাকে তবে ঐ হারে বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু উভয় পক্ষের টাকা যদি চক্রবৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে সুদ নিয়া খাটান যায় তবে কিছু দিন পরে দুই তহবিলে অনেক পার্থক্য হইয়া পড়িবে। লোক সংখ্যার সামাজিক তহবিল সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা চক্রবৃদ্ধির নিয়ম বেশ দেখিতে পাইব। আরও দেখিব যে এক তহবিলে স্থিতি খুব কম, আয়েক তহবিলে স্থিতি খুব বেশী।

তহবিলের টাকা হিসাব করিতে গেলে লোকে সাধারণতঃ দুইটী বিষয়ের দিগে লক্ষ রাখে। (১) পূর্ব্বনিয়মানুসারে তহবিল বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা; (২) পরের তহবিলের সহিত তুলনা। মনে করুন ১৩১২ সনে আমার তহবিলে শতকরা ১২ টাকা হিসাবে টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৩১৩ সনে বৃদ্ধির হার শতকরা ১৪৲ টাকা কিন্তু ১৩১৪ সনে বৃদ্ধির হার শতকরা ১০৲; তৎপরবর্ত্তী বৎসরে বৃদ্ধির হার ৯৲ টাকা মাত্র। এই প্রকার যদি অবস্থা দাড়ায় তাহা হইলে বড়ই শোচনীয় কথা। বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বেশী হউক ইহাই বাঞ্ছনীয়। সত্য বটে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া যায় নাই। তথাপি এতৎ সম্বন্ধে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা পশ্চাতে দেখাইব। যাই হউক, দ্বিতীয় দফা অনুসারে হিসাব করিতে গেলে পরের সঞ্চিত ধনের সহিত নিজের সঞ্চয়ের তুলনা করিতে হয়।

অন্য অপেক্ষা আমার তহাবিল যদি বেশী হইল তবেই "আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।" আর যদি কম হইল তবে ক্ষণকালের জন্য গগণভেদী আর্ত্তনাদ। অপরের সহিত তুলনা করিয়া নিজের কর্ত্তব্য ঠিক করা যে একবারে অসঙ্গত আমরা তাহা বলিতেছি না। তবে তুলনা কালে হিংসা বৃত্তিটুকু যদি জাগরিত না হয় তবেই মঙ্গল। মূল কথা পূর্ব্ব বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী হইয়াছে; ইহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমানের বর্দ্ধিত সংখ্যার সহিত তুলনা করিয়া এখন আমরা "হা হতোস্মি" হইয়াছি।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রত্যেক দশবৎসর অন্তরই এ দেশে লোক গণনা হইতেছে। লোক গণনার ফলাফল যথাবিহিত সাধারণ লোকের অবগতির জন্য প্রকাশিতও হয়। আমরা সে সব খবর রাখিও বেশ। পৃথিবীর সমস্ত খবরই আমরা উদরস্ত করিয়া রাখি। কিন্তু আমাদের উদরস্ত বিষয়গুলি একবারে স্পন্দনহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহারা ভিতরে গেলে আর বহির্গত হইতে চায় না; ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে নিগ্রহের নিগড়ে সংবদ্ধ হইলে সময় সময় আমাদের উদরস্ত বিদ্যাবুদ্ধির বিকাশ দেখা যায় বটে।

ভারতের লোকক্ষয়, বঙ্গের লোকক্ষয়, হিন্দুর লোকক্ষয় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ইহার সত্যতা উপলব্ধির জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে হয় না, স্থানের অনুসন্ধান করিতে হয় না, পাত্রের খোজ করিতে হয় না। যে কোন সময়ে যে কোন স্থানের প্রতি লক্ষ করিলেই অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে এবং সময় বিশেষে মৃত্যু তালিকার পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু মোটের উপর বাদ কখনও পড়ে না। চক্ষু উন্মিলিত করিলেই মৃত্যুর অপাত্র-নিক্ষিপ্ত-ভীষণ-বদন-ব্যাদন অবলোকন করা যায়। দেখিতে যাহারা অনিচ্ছুক তাহারা কাগজেও তো পড়িয়া

থাকে। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহিক কাগজেই মৃত্যুর তালিকা দেওয়া হয়। আমরা কাগজ পাঠ করি কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া? যাই হউক দশ বৎসর পরেই আমরা লোক সংখ্যা সম্বন্ধে একটা হিসাব পাই। তখনই তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই আমরা তাহা বলিতেছি না; তবে দুঃখের কথা এই যে আলোচকের আলোচনা কার্য্যক্ষম লোকদিগের দরবারে স্থান পায় না, তজ্জন্যই আমাদের দেশের দুঃখদৈন্যের হ্রাস না হইয়া বরং উত্ত-রোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। যাহা হউক পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা যখন মুসলমান সংখ্যার সহিত মানদণ্ডে ঝুলান হইল তখন আমরা জাগ্রত হই-লাম। জাগ্রত হইলাম সত্য কিন্তু হাত মুখ ধোওয়ার এখনও অনেক বিলম্ব!! যাহা হউক, সুখ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াই লোক সংখ্যা সম্বন্ধে একবার আলোচনা করা হউক।

দশম পরিচ্ছেদ।

লোক সংখ্যা।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম লোক গণনা হয়। প্রত্যেক দশ বৎসর পরে একবার গণনাকার্য্য হইয়া থাকে। এই হিসাবে এদেশে ৩০ বৎসরে ৪ চারি বার লোক সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে। আগামী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আবার লোক গণনা হইবে। লোক গণনার তালিকাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে। জাতিবর্ণ, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম অনুসারে লোক সংখ্যা করা হইয়া থাকে। ইহাতে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা, শিক্ষিত অশিক্ষিতের সংখ্যা; সধবা বিধবার সংখ্যা, ধনী নির্ধনের সংখ্যা, বালক

বৃদ্ধের সংখ্যা প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাহারা স্বজাতি বা স্বসম্প্রদায়ের তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে লোক গণনার তালিকা বিশেষ উপকারী। সত্য বটে, ইহাতে কোন বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না, কিন্তু ফলগুলি বেশ জানা যায়। কারণ নির্দ্দেশ করা ফলভোগী লোকদিগের বণ্টকে। আমরা ফলাফল, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ভোগ করিতে বাধ্য, তবে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম হইব কেন? নিজের ভক্ষ্য ফলের জন্য কিছুমাত্র কষ্টই কি করিতে পারিব না? ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি আর নাই পারি, তত্ত্ব নিতে অবহেলা করিব কেন? আমরা মনে করি শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই সকল সংবাদ জানা আবশ্যক। লেখাপরা জানা লোকের পক্ষে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকা বড়ই লজ্জার কথা!! নিজের সম্প্রদায়ের সংবাদ মনুষ্য মাত্রেরই রাখা কর্ত্তব্য, ইহাও কি উপদেশসাপেক্ষ? যাহা হউক লোক সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা যে তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

লোক সংখ্যার তালিকা।

খৃষ্টাব্দ	হিন্দু		মুসলমান		
	লোক সংখ্যা	পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি	লোক সংখ্যা	পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি	হিন্দু অপেক্ষা বৃদ্ধি
১৮৭১	১৭১০০০০০		১৬৭০০০০০		হিন্দু চারি লক্ষ বেশী
১৮৮১	১৭২৫০০০০	১৫০০০০	১৭৯০০০০০	১২০০০০০	৬৫০০০০
১৮৯১	১৮০০০০০০	৭৫০০০০	১৯৮০০০০০	১৭০০০০০	১৬০০০০০
১৯০১	১১৪০০০০০	১৪০০০০০	২২০০০০০০	২৪০০০০০	২৬০০০০০
৩০ বৎসর		২৩০০০০০		৫৩০০০০০	

উপরে প্রদত্ত তালিকা অনুসারে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে ৩০ ত্রিশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা ২৭ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে আর মুসলমানের সংখ্যা ৫৩ লক্ষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথম গণনাকালে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা চারিলক্ষ বেশী ছিল কিন্তু ত্রিশ বৎসর পরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যা ২৬ লক্ষ বেশী হইয়াছে। এই অবস্থা দর্শনে অনেকেই হিন্দুর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আকুল হইয়াছেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "হিন্দুদের অস্তিত্ব" শীঘ্রই লোপ পাইবে। "মুসলমানের বৃদ্ধি ও হিন্দুর হ্রাস যে ভাবে হইতেছে তাহা দেখিয়া হিন্দুর অস্তিত্ব কত বৎসরে বিলপ্ত হইবার সম্ভাবনা তাহা পর্য্যন্ত" গণনাদ্বারা ঠিক করা হইয়াছে। বিষয়টা বড়ই চিন্তনীয়, ভাবিতে গেলে মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়া যায়; হিন্দুর বংশ ত আর রহিলনা!! এই দুর্ভাবনায় অনেক পাঠক মহাশয়ও যে অস্থির হইয়া পড়িবেন!! অস্থির হওয়ারও কথা; যে হিন্দু জাতি সভ্য জগতের প্রাচীনতম আদর্শ, যে হিন্দুজাতি ইতিহাসের অনধিগম্য সময় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছিল, হায় হায়, সেই হিন্দুজাতি ৩০ ত্রিশ বৎসরের চারি কিস্তির লোক গণনার ফলে লুপ্ত হইতেছে একথা ভাবিলে পাঠক লিখক সকলেরই যে আহার নিদ্রা পরিত্যজ্য হইবে। এ দুশ্চিন্তার আর দরকার নাই; পাঠক মহাশয়রা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া অশান্ত চিত্তকে শান্ত করুন। আপনাদের চিত্তবিনোদনার্থ আমি একটা গল্প বলিতেছি, সত্য ঘটনা, পাঠ করিয়া একটু শান্তি উপভোগ করুন।

হেলি সাহেবের আবিষ্কৃত দীর্ঘপুচ্ছ ধুমকেতুর সংঘর্ষে সমগ্র পৃথিবী মূহুর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যাইতে পারে। এই ভয়াবহ সংবাদে মনুষ্য মাত্রই যে উৎকণ্ঠিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সাধের পৈত্রিক সম্পত্তি পৃথিবী খানা বুঝি যায় যায়!! এই উপলক্ষে ইতি কর্ত্তব্য অবধারণ

জন্য সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশের কোনও এক পল্লীগ্রামে একটী সভা আহুত হয়। গ্রামবাসী গণ্যমান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপস্থিত হইল, যথাবিহিত সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সুবিবেচক ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাব করিলেন "ধুমকেতুর আবির্ভাবে সকলকেই যখন মরিতে হইবে, তখন কি ভাবে মরা উচিত, এ সম্বন্ধে সকলের মতামত প্রকাশিত হউক।" এক জন বিজ্ঞলোক বলিলেন "ধুমকেতুর চাপটে মরিব কেন? কষ্ট করিয়া মরা অপেক্ষা আমোদ প্রমোদ করিয়া মরণই শ্রেয়স্করর। সুতরাং আমোদ প্রমোদ করিয়া মরিবার উপায় করা হউক।" বলাবাহুল্য করতালী দ্বারা সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু একটী লোক এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। তথায় উপস্থিত এক জন ধর্ম্ম প্রচারক বা মিসনারী বলিলেন "মরণই যদি সকলেরই অনুমোদিত হয় তবে গির্জার সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া যিশু খৃষ্টের নাম নিতে নিতে মরাই ভাল। তাহাতে আত্মার সদ্যঃমুক্তি হইবে।" এই প্রস্তাবে কিন্তু অনেকেই মত দিল না। প্রতিবাদিগণ বলিল "গির্জার সম্মুখভাগে সকলে একত্র হইয়া সংকীর্ণ স্থানে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া কেন মরিব? এ প্রকার মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। সকলেই যখন মরিব তখন আবার মুক্তি কি? ওপ্রকার মুক্তির কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। আমরা আমোদ প্রমোদ করিতে করিতে মরিব। তাহা হইলে আর মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। আমরা এবার সুখের মরা মরিব।" সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ইহাই অবধারিত হইল। সুখের মরার দিন নির্দ্দিষ্ট হইল; আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইতে লাগিল। বিস্তৃত মাঠে প্রকাণ্ড চাঁদোয়াও উত্তোলিত হইল; গেলনে গেলনে মদ আসিল; চাটুনীর জন্য নানাবিধ সামগ্রী উপস্থিত হইল; সুখের মরার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তৎসমস্তই প্রচুর পরিমাণে যোগার করা হইল। অবশ্য

নৃত্যগীতেরও যথেষ্ঠ আয়োজন হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে সকলেই তথায় উপস্থিত হইল; সুখের মৃত্যুর জন্য সকলেই আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইল। কোনপ্রকার দুঃখ-কষ্টের চিহ্ন নাই, বিশাদের লক্ষণ নাই, কেবল আমোদ, কেবল আনন্দ; নাচগানের ধুম আরম্ভ হইল, সুর। সেবন অবিরামে চলিতে ছিল; সুখের মৃত্যু কি না; মরাও চাই, সুখও চাই; এ দৃশ্যের বর্ণনা করা অসম্ভব; আমাদের এ দেশে ঐ প্রকার মৃত্যুর কল্পনাও কেহ করিতে পারে না! যাহা হউক সুখের মরা আরম্ভ হইয়া গেল; ৪।৫ ঘণ্টার আমোদের পর সকলেই সুখের মরাকে লাভ করিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, সুখের মরা সকলের পক্ষে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। কেহ ৫।৬ ঘণ্টা পরে, কেহ বা ১০।১২ ঘণ্টা পরে সুখের মরাকে পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন যে তিনি সজীব পদার্থই রহিয়াছেন। অনেকে গবেষণা করিয়াও দেখিলেন যে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় নাই, সুখের মরার পূর্ব্বজন্মের সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। এমন কি সেই সাধের পৃথিবী পর্য্যন্তও পূর্ব্ব অবস্থায়ই রহিয়াছে। ধুমকেতুর আক্রমণের দিনও চলিয়া গিয়াছে। শেষে বুঝা গেল এক পচাত্তর বৎসরের জন্য পৃথিবী খানা রহিয়া গেল। থাকুক; ইহাতে আমাদেরও স্বার্থ আছে। আমরা সুখের মরা মরিতে পারিব না সত্য, কিন্তু পৃথিবীখানা বজায় থাকিলে দুঃখের কান্না কাঁদিতে পারিব।

সম্ভবতঃ পাঠক মহাশয়রা এইক্ষণ একটু শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছেন। ধুমকেতু যখন পৃথিবী ধ্বংশ করিতে পারে নাই, লোক সংখ্যার গণনায়ও তখন হিন্দুবংশ ধ্বংশ করিতে পারিবে না বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন। ধুমকেতুর মুদ্দত পঁচাত্তর বৎসর, আর লোক সংখ্যার মুদ্দত দশ বৎসর; সুতরাং অন্ততঃ দশ বৎসরের জন্য আমরা রেহাই পাইলাম।

এ ক্ষণ আমাদের মূল কথা। হিন্দুর ধ্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা কি সে

হয় আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপর কোন জাতির সহিত তুলনা করিয়া হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে আমরা কিছুই বলিব না। এ সব স্থলে বৃদ্ধির হার নির্ণয় করিলেই বিষয়টা সহজ বোধ্য হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব প্রদর্শিত লোক সংখ্যার তালিকা অনুসারে বৃদ্ধির হার নির্ণয় করিতেছি। নিম্নপ্রদত্ত শতকরা হার দৃষ্টে পাঠক মহাশয়রা বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দুর ধ্বংশের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বা মিথ্যা।

দশ বৎসরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির শত করা হার।

সন খৃষ্টাব্দ।	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭১—১৮৮১	·৮৭	৭.১৮
১৮৮১— ৯১	৪.৩৪	৯.৫
১৮৯১—১৯০১	৭.৭	৬.১

এই হিসাব অনুসারে দেখা যায় প্রথম দশ বৎসরে হিন্দুর গড়ে এক জনও বৃদ্ধি হয় নাই তৎপরবর্ত্তী প্রত্যেক দশ বৎসরেই হিন্দু সংখ্যার ক্রমোন্নতি। বলা অতিরিক্ত যে শেষোক্ত দশ বৎসরে মুসলমানের অবনতি হইয়াছে।

যদ্যপি বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রম করিয়া হিন্দুদিগকে ধ্বংশ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছি তথাপি আমরা বিশেষ সুখী হইতে পারি নাই। হিন্দুর সংখ্যা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে না। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা নিম্নে আর একটা হিসাব দিলাম।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হাজার করা বাৎসরিক তালিকা।

দেশের নাম		হাজার করা বাৎসরিক বৃদ্ধি।
ইংলণ্ড	... ...	২৮ জন
অষ্ট্রেলিয়া	... ...	২৮ জন
জার্ম্মেনী	... ...	৩৬ জন
ইতালী	... ...	৩৫ জন
বঙ্গদেশে	হিন্দু ...	৭ জন
	মুসলমান ...	৬ জন

এই হিসাবে দেখা যায় হিন্দুর সংখ্যা খুব কমই বাড়িতেছে। জার্ম্মেনীর ন্যায় প্রত্যেক বৎসরে হাজারে ৩৬ জন বৃদ্ধি হইত তবে বাস্তবিকই আমরা সুখী হইতে পারিতাম। ভগবান সে দিন কখন করিবেন জানি না।

এস্থলে আমরা একটু টিপন্নী না কাটিয়া পারিলাম না। ভারতের লোক সংখ্যা বা হিন্দুর লোক সংখ্যা সম্বন্ধে দুই প্রকারের সিদ্ধান্ত প্রচলিত হইতেছে। এক দল বলিতেছেন হিন্দুর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, আলস্যপরতন্ত্র হিন্দুরা কেবল অযথা বংশ বৃদ্ধিই করিতেছে। অপর এক দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হিন্দুর সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে যে উহা অতি শীঘ্রই ধ্বংশ হইবে। দুইটা মত সম্পূর্ণ বিপরীত; এখন এই দুই মতে তর্কবিতর্ক চলিতে থাকুক, আর আমরা তৃতীয় একটা মত প্রচার করিতে আরম্ভ করি—দুই মতের কোনটীই অভ্রান্ত নহে, হিন্দুর ধ্বংশও নাই আর অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধিও নাই, ভগবানের ইচ্ছা যে প্রকার ফলও তেমনই হইবে। সত্য বটে অপরাপর জাতির সহিত তুলনা করিলে মনটী কিছু খারাপ হয়; অপর জাতিতে সংখ্যাধিক্য অত্যন্ত বেশী। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে অসন্তুষ্টির

কিছু মাত্র কারণ নাই। অগণিত নক্ষত্রে নৈশ অন্ধকার দূর করিতে অক্ষম, কিন্তু চন্দ্র একাকীই অন্ধকারকে বিনাশ করে সুতরাং চন্দ্র ছাড়িয়া নক্ষত্রের প্রতীক্ষা করা বিড়ম্বনা। সংখ্যায় কম হইলেও আমরা প্রকৃত হিন্দু চাই ; হিন্দুগণ যদি হিন্দুচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হয় তবে সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন কোনই আক্ষেপ থাকিবে না। আমরা চাই প্রকৃত হিন্দু ইতি তৃতীয় মতের ভাষ্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

হিন্দু-সংখ্যা কম কেন ?

"হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস" সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিবার বিশেষ কিছু আবশ্যতা নাই। আমরা দেখিব, হিন্দুর সংখ্যা কি কি উপায়ে বর্দ্ধিত হইতে পারে। আমরা জানি তহবিল বৃদ্ধির চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে। যাহারা প্রকৃত উন্নতি কামনা করে তাহারা স্বাধীনভাবে সঙ্গত উপায়ে আয় বাড়াইয়া নিতে চেষ্টা করে ; শুধু তাহাই নহে, অযথা খরচে তহবিলের যেন ক্ষতি না হয় তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। হিংসা বিস্ফারিত নয়নে অপরের বর্দ্ধিত তহযিলের দিকে তাকাইলে কিছুই ফল নাই। এভাবে যে কেহ উন্নতি করিতে পারিয়াছে তাদৃশ নিদর্শন আমরা খুজিয়া পাই না। বিশেষতঃ হিংসাবৃত্তির উত্তেজনা করা হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী সুতরাং উহা হিন্দুর অকর্ত্তব্য।

হিন্দুর সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা দুইটী বিষয়ের দিগে লক্ষ রাখিব ; প্রথম বিষয় নিয়মিতরূপে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। দ্বিতীয়

বিষয় বর্দ্ধিত সংখ্যা অযথাভাবে হ্রাস পাইতেছে কিনা। হিন্দুর সংখ্যা যে নিয়মিতরূপে বা আশানুসারে বৃদ্ধি পাইতেছে না সম্প্রতি আমরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা দৈব, বা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফল সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলিব না। কর্ম্মফল বা দৈব যদ্যপি জন্ম মৃত্যুর অন্যতর কারণ তথাপি ইহজন্মের কর্ম্মফলকেই জন্ম মৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। দৈব বা কর্ম্মফল খণ্ডান বর্ত্তমান কালের লোকের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব; সুতরাং তৎবিষয়ক আলোচনাও প্রায় নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহজীবনে জন্ম মৃত্যুর সহিত যে সকল কার্য্যের ঘনিষ্টতা রহিয়াছে এই স্থানে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। যে সকল দোষ হইতে মুক্তি লাভ করা আমাদের স্বকীয় ক্ষমতার অন্তর্গত আমরা তাহারই আলোচনা করিব। সুতরাং হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ নির্দ্দেশ কল্পে আমরা "আত্মকৃত দোষের" উল্লেখ করিব। বলা বাহুল্য আমরা আত্মকৃত দোষ হইতে আত্মসতর্কতা দ্বারাই মুক্ত হইতে পারি।

আমাদের আত্মকৃত দোষেরও কতকগুলি দফা আছে। তন্মধ্যে প্রথমতঃ আমরা "নষ্ট বীর্য্যের" বিষয় আলোচনা করিব। এক কথায় বলিতে হইলে অধিকাংশ লোকেরই বীর্য্য দূষিত। তাহার ফলেই যথা সময়ে সন্তান জন্মিতে পারে না। যদ্যপি সন্তান জন্মে, সেও নিতান্ত দুর্ব্বল, ক্ষীণকায়, অনেক সন্তান শৈশব কালেই দুষ্ট মাতাপিতার পাপের শাস্তি প্রদান করিয়া জন্মান্তর গ্রহণ করিতে চলিয়া যায়। বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টিতে দূষিতবীর্য্য লোক ঠিক করা কথঞ্চিৎ কষ্টকর। বাহ্যিক চেহারার বৈলক্ষণ্য, স্ফুর্ত্তিহীনতা, নানাপ্রকার রোগের আক্রমণ, মস্তিষ্কের চাঞ্চল্য, বুদ্ধিহীনতা প্রভৃতি কতকগুলি কারণে বীর্য্যের দূষনীয়তা ঠিক করা যায়। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি কারণ আছে। এমন সব

চাঞ্চস ঘটনা আছে যাহা হইতে আমরা সহজেই নষ্ট বীর্য্যের ফলাফল উপলব্ধি করিতে পারি।

হিন্দু সমাজে প্রায়ই এখন মৃতবৎস্যা দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে মৃতবৎস্যা দোষে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইতেছে। এখন দেখা কর্ত্তব্য মৃতবৎস্যা দোষ ঘটে কেন? ডাক্তারী মতে দেখা যায় সিভিলেজ বা গর্মি প্রভৃতি ব্যারামেই গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়। মৃতবৎসা দোষ ঘটিবার প্রধান কারণই পিতা বা মাতার দূষিত বীর্য্য।

এখন দেখা কর্ত্তব্য মৃতবৎস্যা দোষের জন্য দায়ী কে; পুরুষ কি স্ত্রী? স্থূল দৃষ্টিতে এ দোষ স্ত্রীলোকের বলিয়াই মনে প্রতীতি জন্মে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে এ দোষ সম্পূর্ণ পুরুষের। কখনও কখনও স্ত্রীলোকের চলাফেরার অতসর্কতা হইতে যে এই দুর্ঘটনা না ঘটে তাহা নহে; কিন্তু তাদৃশ ঘটনা নিতান্ত বিরল; গর্ভবতী স্ত্রীলোক যথেষ্ট সাবধানে চলে; তাহাতেও যদি দুর্ঘটনা ঘটে তাহা হইলে নিশ্চয়ই দৈব নির্ব্বন্ধ। স্ত্রীপুরুষের কৃত কার্য্যের দ্বারা মৃতবৎসা দোষ ঘটিলে সে দোষ কেবল পুরুষের বলিয়াই আমরা প্রমাণ দিব। এজন্য স্ত্রীলোককে দোষী করা আর "উদার পিণ্ড বুধার ঘাড়ে" চাপাইয়া দেওয়া একই কথা। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলেই বুঝা গেল তাহার কোন দোষ নাই, অতঃপর যত গণ্ডগোল সমস্তই পুরুষের দোষে। অতিরিক্ত বীর্য্যক্ষয় বা অস্বাভাবিক রূপে বীর্য্যক্ষয়, নানা প্রকার দূষিত রোগে আক্রান্ত হইয়া শরীরের সর্ব্বপ্রকার শক্তিক্ষয় পুরুষ মহলেই খুব বেশী দেখা যায়। স্ত্রীলোকদের এসব ব্যারাম খুব কমই হইয়া থাকে; যদ্যপি কোথাও কোথাও স্ত্রীলোকের এসব ব্যারাম দেখা যায় তাহাও

দুষ্ট স্বামীর সংসর্গজনিত। যাই হউক এবার হইতে মৃতবৎসা দোষ পুরুষের ঘাড়েই পড়িল।

পুরুষেরই বা এ সব ব্যারাম হয় কেন, এইক্ষণ তাহাই আলোচ্য। সংসর্গ দোষই ইহার প্রধান কারণ। পুরুষগণ নিতান্ত শৈশবকালে ১২।১৪ বৎসর বয়সের সময়েই নানা প্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে বীর্য্যপাত করে। ইহা বোধ হয় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ না করিলেও ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সংসর্গের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অবিমৃষ্যকারী এবং অবিবেচক বালকগণ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে বেশ অভ্যাস করে। হতভাগারা ত জানে না যে, এই আপাতমধুর বিষ তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখশান্তিকে সমূলে বিনাশ করিবে। কে তাহাদিগকে বুঝাইবে? পিতা মাতা উদাসীন, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেহ বা কুকাজের সাথী, কেহ বা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। এই সকল বিভৎস কাণ্ডের কত প্রকার অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়!! সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া নিজ নিজ আত্মাকে কলুষিত করা আমরা নিরর্থক মনে করি। কত শিক্ষক পর্য্যন্ত ছাত্রের কুকাজের শিক্ষকতা করেন, কত জ্ঞানী গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সমস্ত পাপের পথিক শুনিলে মস্তকে বজ্রাঘাত সদৃশ ভীষণ বেদনা অনুভূত হয়। সব কুশিক্ষার ফল, সব কুসংসর্গের ফল, সংযমের অভাব, সুশিক্ষার অভাব; অভিভাবকের কর্ত্তব্য জ্ঞানহীনতাই ইহার প্রধান কারণ!!

পিতামাতা কিম্বা অভিভাবক স্থানীয় লোকের একান্ত কর্ত্তব্য ছেলেদিগকে অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টির মধ্যে রাখা; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের খবর নেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যে স্থলে সন্দেহজনক কোনও লক্ষণ উপস্থিত হয় সে স্থলে ছেলেদিগকে একবারে সঙ্গে রাখা উচিত। বাহ্য প্রস্রাব

করিতে যাইয়া যেন কুকাজের অবসর না পায় তৎপ্রতিও অভিভাবকের মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। নিস্তব্ধ রজনীর কোমল ক্রোড়ে সুখনিদ্রায়শায়িত ছেলেকে মাঝে মাঝে পরিদর্শন করা নিতান্ত উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশীয় অভিভাবকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেক সরল বিশ্বাসী লোক এসব বিষয়ে কিছু জানেনও না; কিছু বুঝেনও না; আর শিক্ষিত সমাজেতো ওসব কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যেই পারগণিত নহে; সামান্য মাত্রায় কর্ত্তব্য বোধ থাকিলেও সময়েই কুলায় না। দাদারা অনেকেই ছাত্রের শিক্ষক।

সে যাহা হউক হিন্দু বালকগণের বীর্য্য নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ আমরা উল্লেখ করিলাম। আরও আছে; ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহে যাহারা বাল্যজীবনে এসমস্ত দোষে আক্রান্ত হয় না তাহারাও অনেকে তাহাদের "সহরে জীবন" নিতান্ত কলুষময় করিয়া ফেলে। অধিকাংশ ছাত্র মহলে, শুধু তাহাই বা বলি কেন; অধিকাংশ ভদ্রলোকেরই এই মুদ্রা দোষটুকু আছে। বিবাহিত পুরুষ সস্ত্রীক সহরে বাস করে, এমন হতভাগারাও "ফুর্ত্তি ডু", করিবার জন্য কুপথগামী হয়। অভ্যাস কি মজার জিনিষ, একবার অভ্যস্ত হইলে আর কি পরিত্যাগ করা চলে? কিছুদিন 'ফুর্ত্তির" মধুময় রস "আকণ্ঠমঠনং" পান করিয়া যখন দেহকে রোগের আকর করিয়া তোলে, তখন কাহারও কাহারও সুবুদ্ধি উপস্থিত হয়; তখন পাপের অনুতাপে ভারাক্রান্ত বিমর্ষ মন সহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আর ঘরে বসিয়া ক্রমশঃ বীজপাত করিতে থাকে। তাহাতেও বেশ ফসল জন্মে। কোন সন্তান গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়, কোনটী বা জন্মিয়া মারা যায়, কোনটী রুগ্ন, কোনটী অঙ্গহীন; এই প্রকার কত কি? কাহারও কাহারও বা সন্তান জন্মেই না।

উপরোক্ত কথাগুলি যদ্যপি সত্য তথাপি বোধ হয় আমার লেখার

দোষে গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে, পাঠকদিগের বুঝিয়া উঠা কষ্টকর হইতে পারে। তজ্জন্য তাঁহাদের খাতিরে একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছি। লোক বৃদ্ধির অন্তরায়রূপে সম্প্রতি আমরা নিম্ন লিখিত কয়েকটী বিষয় নির্দ্দেশ করিতেছি—মৃতবৎসা দোষ, সন্তান না হওয়া, জাত সন্তানের অকাল মৃত্যু বা অকর্ম্মণ্য শরীর ধারণ। এই কারণ গুলির প্রত্যেকটীই পুরুষে দোষে ঘটিয়া থাকে। এই মাত্রই আমাদের বক্তব্যের সারাংশ।

এই সমস্ত দোষের উৎপত্তিস্থল কোথায় আকার ইঙ্গিতে তাহাও আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকগণও বোধ হয় স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিয়াছেন। তবু মনের রাগে আরও কিছু বলিতে হইল। এই সব দোষ শিক্ষিত সমাজেই বেশী। মুসলমান সমাজেও এই বিদ্যা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। ভায়াদিগেয় পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য।

পাঠক মহাশয়রা একটু কষ্ট স্বীকার করিবেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, বিদেশবাসী এবং গৃহবাসী, লোকদিগের অবস্থাটা একবার পর্য্যালোচনা করিবেন। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সহরের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া গ্রামের প্রতি লক্ষ রাখিলে কাজটা সহজসাধ্য হইতে পারে। আর যিনি ইহার কোন দফাতেই রাজী নন, তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা অধ্যয়ন কালে নিজের গত জীবনের মানচিত্রখানা নয়ন গোচরে রাখিবেন, দেখিবেন কোথায় কি চিহ্ন রহিয়াছে। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি না, তাহা করাও ঠিক নহে—বড় লজ্জার কথা; নিজে নিজে বুঝিবার জন্যই বলিতেছি। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিলে আমাদেয় অনুমান এবং অনুসন্ধান সত্য কিনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

গ্রামে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে যত গণ্ডগোল সবই শিক্ষিত সমাজে। অশিক্ষিত সমাজে এসব খুব কম। যত স্ত্রীলোকের মৃতবৎসা দোষ আছে, অনুসন্ধান করিলে জানিবেন, তাহাদের স্বামী নিশ্চয়ই কুপথগামী, যৌবনে বা তৎপূর্ব্বে দেহের উপর, শুধু দেহের উপর কেন, জীবনীশক্তির উপরে, দেহের সারবান পদার্থের উপরে, মনুষ্যত্বের উপরে, নিতান্ত অত্যাচার করিয়াছে, নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে, পাশব অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু অশিক্ষিত সমাজে এসব দুর্দ্দৈব খুব কম। তাহাদের যথাসময়ে সন্তান জন্মে। নিঃসন্তান লোক অশিক্ষিত সমাজে অতি বিরল। যে বয়সে বা যে সময়ে অশিক্ষিতের ৩।৪টী সন্তান জন্মে সেই সময়ে শিক্ষিতের হয়ত কিছুই নহে, অধিকন্তু নানা প্রকার কাণ্ড কীর্ত্তন করিয়া ঘোরতর পারিবারিক অশান্তি সংঘটন করিয়া থাকে।

সতেজ বীর্য্যের লক্ষণ সন্তান উৎপাদন। দেড় বৎসর কিম্বা দুই বৎসর অন্তর সন্তান জন্মিলে বুঝা যায় যে সে ক্ষেত্রে কিছু মাত্র দোষ নাই। ইহার ব্যতীক্রম ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে ভিতরে ভয়ানক গণ্ডগোল আছে। সত্য নয় কি কথা গুলি?

সন্তান না জন্মিবার দোষটাও আমরা পুরুষের ঘাড়েই চাপাইয়াছি। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে দোষ পুরুষেরই বটে। তবে আমাদের উপর একটা জেরা হইতে পারে; বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের বেলায়ও কি পুরুষ দুষী? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে দিতে হইবে সত্য, কিন্তু আগে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; স্ত্রীলোকটী যে বন্ধ্যা তাহার প্রমাণ কি? যদি কেহ বলেন যে পুরুষের সন্তান উৎপাদন শক্তি আছে কিন্তু স্ত্রীর তাহা নাই; আমরা বলিব পুরুষের সে শক্তির পরিচয় কোথায়? যদি ক্ষেত্রান্তরে পুরুষ সে শক্তির পরিচয় দিতে অগ্রসর হয় তবে পাশ ফেল

পরের কথা প্রথমতঃ ত তাহাকে একবার দুষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। সাবধান সে-পরীক্ষার দরকার নাই; তাহাতে উভয় শঙ্কট। কথা হইতেছে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয় কি না? বন্ধ্যা কথাটা আমরা যে ভাবে, যে অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকি তাহাতে বুঝা যায় যে "স্ত্রীর সন্তান উৎপাদন বা গর্ভধারণ ক্ষমতা নাই; আর তাহার সে ক্ষমতা জন্মিবেও না।" বাস্তবিক অর্থ কিন্তু এরূপ নহে; স্ত্রীর গর্ভধারণ-ক্ষমতা আছে কিন্তু কোনও প্রকার সাময়িক কারণ বা ঘটনাবশতঃ সন্তান জন্মিতেছে না। তাই "বন্ধ্যা" কথাটা প্রায় অমূলক বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস, শুধু এই নহে, আমরা ইহার প্রমাণ দিতেও চেষ্টা করিব। পুরুষজাত চালাক কি না, তাই আগেই স্ত্রীলোকের উপর দোষ দিয়া নিজেরা সাধু সাজিয়া রহিয়াছেন। সে যাহা হউক সন্তান উৎপাদন বিষয়ে এখন একটু আলোচনা করা হউক।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

"রক্তেন কন্যামধিকেন পুত্রং শুক্রেন"

অর্থাৎ রক্তের আধিক্যে কন্যা এবং শুক্রের আধিক্যে পুত্র জন্মে।

(চরক, শারীর ২য় অধ্যায়)

"অত্র শুক্রবাহুল্যাৎ পুমান্ আর্তব বাহুল্যাৎ স্ত্রী সাম্যাদুভয়োর্নপুংসকমিতি"

অর্থাৎ শুক্র বেশী হইলে পুত্র, রক্ত বেশী হইলে কন্যা, আর শুক্র রক্ত সমান হইলে নপুংসক জন্মিবে।"

(সুশ্রুত, শারীর ৩।৪)

এই সমস্ত ঋষিবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায় শুক্র এবং রক্তের সংযোগে সন্তান উৎপন্ন হয়। শুক্র পুরুষ হইতে এবং রক্ত স্ত্রী হইতে বহির্গত হইয়া যথা নিয়মে সংযুক্ত হইলেই সন্তান জন্মিবে; তাই চলিত ভাষায় একটা কথা আছে "মাতৃরজে, পিতৃবীর্য্যে"—সন্তানের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা

দেখিতেছি রক্ত এবং বীর্য্য মিশ্রিত হয় সত্য কিন্তু সন্তান জন্মে না। দোষ কাহার? যদি শুক্র নির্দ্দোষ হয় তবে রক্তের দোষ স্বীকার করা যাইতে পারে। রক্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণও যদি শুক্রের সহিত মিলিত হয় তবু সন্তান জন্মিবে। কিন্তু শুক্রের নির্দ্দোষিতা সত্ত্বেও যদি সন্তান না জন্মে তবে বুঝিতে হইবে যথানিয়মে রক্ত এবং শুক্রের যোগ হয় নাই; রক্তের কোন দোষ নাই, পরন্তু অন্য কারণে যোগের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। "যোগের ব্যাঘাত" কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য; নিজে নিজে বুঝিয়া নিতে চেষ্টা করাই ভাল।

রক্তের কোন প্রকার দোষ থাকা সম্ভব কি না তাহাও একবার দেখা কর্ত্তব্য। আমাদের হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকগণ এখনও সংসর্গ দোষে দুষী নহে। এমন কোন বাহ্যিক কারণ হিন্দু-অন্তঃপুরে এখনও লক্ষিতভাবে বা অলক্ষিত ভাবে সংঘটিত হয় না যদ্দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের রক্ত দুষিত হইতে পারে। স্বপাকে আহার, প্রায় নির্জ্জন স্থানে বাস, বাহিরে আনাগোনার অভাব, যার তার সঙ্গে মিলামিশা না করা প্রভৃতি আত্ম-শুদ্ধির প্রধান উপায় গুলি হিন্দু স্ত্রীগণ যথেষ্ট রক্ষা করিয়া থাকেন। সংসর্গজনিত দোষের সংক্রামক আক্রমণ হইতে ইহারা এখনও অনেক দূরে রহিয়াছেন। ইত্যাকার অবস্থায়ও যদি তাঁহাদের মধ্যে কোন দোষ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ স্বামীর দোষ, কারণ অন্য সংসর্গ হইতে তাহারা সুরক্ষিতা। সংসর্গ-জনিত কোন দোষ যদি স্ত্রীতে দেখা যায় তবে তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী স্বামী; নয় কি? আর এক কথা; অনধিত শাস্ত্র অনেক হিন্দু হয় ত বলিবেন, স্ত্রী যে বন্ধ্যা হয় তাহা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফল; সুতরাং সন্তান না হওয়ার জন্য স্ত্রীলোকই দোষী। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব না। তবে এস্থলে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে কর্ম্মানুযায়ী ফলানুসারে সন্তান উৎপন্ন না হওয়াতে

যদি স্ত্রীকে বন্ধ্যা বলিয়া দুষী করা হয় তবে বন্ধ্য বলিয়া পুরুষ কেন দুষী হইবে না ? সন্তান জন্মিলে যেমন উভয়েই শূচী, সন্তান না জন্মিলেও কর্ম্মানুসারে উভয়েই দুষী।

সন্তান না জন্মিবার দরুণ যদি স্ত্রীলোকের কোন দোষ থাকা সম্ভব হয় তবে তাহা দুই অবস্থাতে প্রমাণিত হইতে পারে। এক অবস্থা রক্তাধিক্য আর এক অবস্থা রক্তহীনতা।

গ্রামদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে। লাউ কুমড় গাছ পাতা ডোগায় যখন খুব বর্দ্ধিত হয় অথচ ফল ধরে না তখন লোকে বলে "গাছ গুলি বড়িয়া গিয়াছে।" তাই তাহারা গাছের "পাতা ডোগা" কাটিয়া কমাইয়া গাছকে নির্জোর করিয়া দেয়, তার পরে বেশ ফল ধরে। এই অবস্থাটা স্ত্রীকের সঙ্গেও বেশ মিলিয়া যায়। পূর্ণ যৌবনা স্ত্রীলোক খুব হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠা অথচ সন্তান জন্মিতেছে না ; ইত্যাকার অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে তাহারাও "বাড়িয়া" গিয়াছে। এই সময় তাহাদের শরীর খুব তেজস্বী থাকে ; তজ্জন্যই তাহাদের রক্ত বীর্য্যের সহিত মিলিতে পারে না। তাই সন্তানও হয় না। প্রত্যেক ঋতুকালেই স্ত্রীলোকদিগের এই অবস্থাটা অল্লাধিক্ পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য আমাদের শাস্ত্রকারগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

অশ্নীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃণ্ময় ভাজনে
স্বপেৎ ভূমাবপ্রমত্তা ক্ষপেদেব মহস্ত্রয়ং
স্নায়ীত চ ত্রিরাত্রান্তে সচেনমুদিতে রবৌ
ক্ষামালঙ্কদবাপ্নোতি পুত্রং পূজিত লক্ষণং।

ঋতু অবস্থায় স্ত্রীলোক তিন দিন দিবাভাগে অনাহার থাকিয়া কেবল রাত্রিতে সামান্য পরিমাণ আহার করিবে, ভূ-শয্যায় শয়ন করিবে, এবং

তিন দিন পরে স্নান করিবে। এই প্রকারে ক্ষীণ ভাবাপন্ন হইয়া অলঙ্কৃতা হইলে পূজ্য পুত্র লাভ করিতে পারিবে।

(বেদব্যাস)

"ঋতৌ প্রথম দিবসাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী..............."

ঋতুর প্রথম দিন হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; দিবানিদ্রা, অঞ্জন ধারন, রোদন, স্নান, অঙ্গমার্জ্জনা, গন্ধদ্রব্য, হাস্য পরিহাস পরিত্যাগ করিবে।

(চরক, শারীর ২।২৪)

ঋতু অবস্থায় সন্তানকামী স্ত্রীকে কি অবস্থায় থাকিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। এ সব নিয়ম এখন ঠিক মত প্রতিপালিত হইতেছে কি? সর্ব্বত্র নহে। অশিক্ষিত সমাজে এই সব বেশ আছে; তাহারা কারণ বুঝিতে পারে আর নাই পারে, নিয়ম প্রতিপালন কর্ত্তব্য বলিয়া কার্য্যগুলি যথাশক্তি করিয়া থাকে। কিন্তু যত ব্যতিক্রম শিক্ষিত লোকের ঘরে। অনেক স্থলে এসব নিয়ম কুসংস্কারের মধ্যেই পরিগণিত, এই গুলি অসভ্যতার নিদর্শন!! "স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার"!! এই প্রকার ব্যাখ্যারও অভাব নাই। কেহ কেহ আদরিণীর দুঃখে কষ্টে দহমান হৃদয়ে নয়নজল সম্বরণ করিতে না পারিয়া বরং চরককেই ভাসাইয়া দেন, তবু নিয়মাদির উপকারিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করেন না। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা, আদিগুরু চরক শুশ্রুত এদেশে এখন অনাদরের পাত্র হইতে পারেন কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দিন দিনই তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে। কালের মহিমা নয় কি?

এইক্ষণ আর এক দফার কথা—রক্তহীনতা। স্ত্রীলোকের শরীরে যদি রক্ত নিতান্ত কমিয়া যায় তবে তাহারা গর্ভধারণে অসমর্থা হয়। রক্ত-

হীনতা ব্যারামে কখনও কখনও স্ত্রীলোলোকের পেটে চাকার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় তাহাতে ঋতুমতী হওয়ার বাধা জন্মায়। এই প্রকার অবস্থায় আমরা চরক বা শুশ্রুতের ব্যবস্থার প্রতিই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিব।

কোন এক বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের কথা আমি জানি। বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি বন্ধ্যা বলিয়াই পরিগণিতা ছিলেন; পুত্র লাভার্থ তাঁহার স্বামীর দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহের আলাপপ্রসঙ্গও হইতেছিল কিন্তু কয়েকজন, অবশ্য বন্ধুব্যক্তি, তাহাকে পরামর্শ দিল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে কাজ করিতে। স্বামীস্ত্রীযুগলেরও তাহাতে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। তাহারা রীতিমত সংযম অবলম্বন করিল, যতদূর সাধ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে লাগিল। প্রায় বৎসরকাল পরে উভয়ে যখন পুত্র কামনা করিল, দুঃখের কথা, তখন একটী কন্যা জন্মিল. কিন্তু সুখের কথা স্ত্রীলোকটীর বন্ধ্যা দোষ দূর হইল।

মনুষ্য মাত্রই নিজ জীবনের ঘটনাগুলি বেশ জানে। শৈশব কি ভাবে অতীত হইয়াছে, যৌবন কি ভাবে চলিতেছে এতৎ সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ জ্ঞান নিজের নিকট পরিজ্ঞাত। লজ্জায় পরের কাছে ব্যক্ত করা কষ্টকর; কিন্তু নিজের মনে মনে চিন্তা করিয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। যাহারা বাল্যে বা যৌবনে অস্বাভাবিক কার্য্য করিয়া দেহ মনকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের ঔষধ পত্রাদি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নতুবা বংশবৃদ্ধির আশা খুব কম; কেবল গর্ভস্রাবেরই পৌনঃপুনিক দেখিবে।

"বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যং"; বীর্য্যধারণ করাই ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্য সংরক্ষণ করিতে পারিলে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করা যায়। সমগ্র জীবনব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য আমরা বলিতেছি না; তাহা সংসার বিরাগী সন্ন্যাসীর

পক্ষেই সঙ্গত। কিন্তু যাহাদিগকে সংসারাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে দার পরিগ্রহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীর্য্যধারণ করা তাহাদের একান্ত উচিত। তাহা হইলে বীর্য্যের অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা খুব কম, বীর্য্য দূষিত হওয়ার ভয়ও থাকে না। সত্যবটে বীর্য্য ধারণ করিতে অনেকেই সচেষ্ট, বীর্য্য ধারণের গুণও অনেকেই জানেন। কিন্তু হালের নিয়ম অনুসারে দেখা যায় বিবাহ না করাই বীর্য্য রক্ষার প্রধান উপায়। এজন্য অনেকে অল্প বয়সে অর্থাৎ ২০।২৫ বৎসর বয়সেও বিবাহ করিতে নারাজ। অল্প বয়সে বিবাহ করাটা বাস্তবিক কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু "ডুবের নীচে জল খাইয়া একাদশীর বাপকে ঠকাইতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে অল্প বয়সের বিবাহই আমরা শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি। নিজের মনের গতি কোন্ দিগে এবং গুপ্তভাবে নিজে কি প্রকার আচরণ করিতেছি তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত নয় কি? 'তালে পড়িয়া রাধানাম' নিলে কোন উপকারই হয় না।

কেবল স্ত্রী সংসর্গই যে বীর্য্যনাশ বা ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গের একমাত্র কারণ তাহা নহে। বীর্য্য স্খলিত বা স্থানচ্যুত হইলেই তাহা নষ্ট হয়। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ চিন্তন প্রভৃতি নানা কারণেই বীর্য্য নষ্ট হইয়া থাকে। কুরুচি পূর্ণ যে কোন বিষয়ে যে কোন ভাবে মনকে নিয়োজিত করিবে তাহাতেই বীর্য্যহানি ঘটিবে। আমাদের দেশীয় যাত্রা বা নাটকের যে অংশ কুরুচি পূর্ণ তাহা দ্বারা যে হৃদয়ের মধ্যে একটা কুৎসিত ভাবের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? এই সকল কুদর্শন হইতে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই সকল বিষয়ে যত দূর সম্ভব সতর্কতা নেওয়া কর্ত্তব্য। মনকে সংযত করা একান্ত উচিত। মনকে বশবর্ত্তী করিয়া কুৎসিত বিষয় হইতে আত্ম রক্ষা করিবার এক মাত্র উপায় কোনও এক নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে মনের নিয়োগ।

যখনই মনে কোন কুভাব উপস্থিত হইবে তখনই কোন দেবদেবী বিষয়ে বা প্রতিমূর্ত্তি বিষয়ে চিন্তা করিবে। অগত্যা কোন মন্ত্রজপ বা আরাধ্য দেবতার নাম জপ করিবে। উল্টা স্রোতে যেমন গুণ দিয়া নৌকাকে চালাইয়া নিতে পারা যায়, সেই প্রকার কুৎসিত বিষয় উপস্থিত হইলে মানসিক জপ দ্বারা মনকে বশবর্ত্তী রাখা যাইতে পারে। বস্তুতঃ মনশিক্ষা বিষয়ে মানসিক জপের মত মহোপকারী বিষয় আর কিছুই নাই। কিছু দিন চেষ্টা করতঃ অভ্যাস করিলে মানসিক জপ প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। তখন যে কোন অবস্থাতে যে কোন স্থানে থাকিয়াও মন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে। মনকে সুশিক্ষিত করিতে হইলে অভ্যাস দরকার, কাজ করা দরকার, কেবল বুদ্ধি পরামর্শ পাকাইলে কোন ফল হয় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ বিভ্রাট।

হিন্দু সমাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার আর এক কারণ বিবাহ বিভ্রাট। রঙ্গমঞ্চে যে "বিবাহ বিভ্রাটের" অভিনয় হয় আমরা শুধু তাহার কথা বলিতেছি না; আমাদের বিবাহ বিভ্রাট—আরও বিস্তৃত। সামাজিক নিয়ম পদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল নিয়মের পরিণতি ঘটাইয়া অল্প বুদ্ধি কলির লোক সমাজের যে কি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করিয়াছে বা করিতেছে এস্থলে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। বিবাহ পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হওয়াতে সমাজে লোক সংখ্যা যে বৃদ্ধি হইতে পারে নাই এস্থলে তাহাই

প্রমাণিত হইবে। বিবাহ পদ্ধতির আলোচনা এস্থলে আমরা করিব না; সময় হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিব।

হিন্দু সমাজে অনেক অবিবাহিত পুরুষ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সুসভ্য উচ্চশ্রেণীতেও এই প্রকার অবিবাহিতের অভাব নাই। বর্ত্তমান সময় যদ্যপি উপযুক্ত বয়সে প্রায় সকল পুরুষই বিবাহ করিতেছে তবু সমাজে অবিবাহিতের সংখ্যা কম নহে। ২০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকার বৃদ্ধ কুমার খুব বেশী ছিল। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এই প্রকার লোক ছিল বলিয়া জানা যায়। এই ভাবে কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করার একমাত্র কারণ যে ব্রহ্মচর্য্য তাহা খুব কম স্থলেই সত্য। নানা প্রকার দায়ে পড়িয়াই অনেক ভদ্রলোককে এই ব্রত অবলম্বন করিতে হইত। অনেকে আর্থিক অবস্থার শোচনীয়ত্ব হেতু বিবাহ করিতে অসমর্থ হইত শুধু তাহাই নহে উপযুক্ত ঘরে সম্বন্ধ না হওয়াতেও অনেকে বিবাহ করিতে পারে নাই। বিবাহ না করিয়া বংশ লোপ করিতেও অনেকে প্রস্তুত ছিল, তবু বিবাহ করিয়া কুল নষ্ট করিতেন না। এই সব কারণে অনেক পরিবারই একবারে লোপ পাইয়াছে।

কেবল পুরুষ মহলেই যে এ দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা নহে। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অনেক শ্রীমতীকেও কুমারী অবস্থায় থাকিতে হইত। এই ব্রতখানা কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে খুব বেশী পরিমাণেই ছিল। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই ৩০।৪০ বৎসরের, বা ততোধিকও, "খুকীরা" অবিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া পিতার কুল মর্য্যাদা বাড়াইত। এখনও বয়স্থা "আইবুড়" মেয়ের অভাব নাই। কুলীন সমাজের বিবাহ বিভ্রাট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কুলীনকাণ্ড এদেশে সকলেই জানে; একদিগে বহু বিবাহ, অপরদিগে বিবাহ না হওয়া প্রভৃতি অশাস্ত্রোক্ত এবং অসামাজিক কার্য্যাবলী দ্বারা সমাজের যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ঠ,

বিশেষতঃ লোক বৃদ্ধির বাধা, হইতেছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শাস্ত্রের নামে লোকে কি প্রকার অশাস্ত্রোক্ত কার্য্য করিতেছে, ধর্ম্মের নামে কি প্রকার অধর্ম্ম করিতেছে, বিবাহ পদ্ধতিতে আমরা তাহা বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই স্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে অশাস্ত্রীয় নিয়ম লোক বৃদ্ধির গুরুতর অন্তরায় হইয়া সমাজকে ভয়ঙ্কর রূপে কলুষিত করিতেছে।

আর এক কাণ্ড বৈরাগী সমাজে। আমরা পূর্ব্বে মনে করিতাম যে, সংসারে যাহাদের আশক্তি নাই, যাহারা সংসারের অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারাই বৈরাগী। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা নহে; বর্ত্তমান সময় তাহাদের অবস্থা যে প্রকার দাড়াইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এখন বৈরাগীদিগের আচরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কুবিষয়ে যাহাদের অনুরাগ আছে তাহারাই বৈরাগী, (বৈ শব্দ নিশ্চয়ার্থক, রাগী অর্থ—কামনাতে যাহার রাগ বা অনুরাগ আছে)। এই বৈরাগী সমাজ যদি রীতিমত সংসার আশ্রম গ্রহণ করিত তবে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম বিপ্লব।

হিন্দু সমাজে লোকক্ষয়ের আর এক কারণ ধর্ম্মবিপ্লব বা সামাজিক বিপ্লব। অল্প দিনের কথা নহে, দুই এক শতাব্দীর কথা নহে, ৮।৯ শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের উপর ভয়ানক অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে।

শুধু প্রলোভনে নহে, শুধু স্তোকবাক্যে নহে, শুধু শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা দ্বারা নহে, শুধু সামাজিক নিয়মের ভঙ্গ দ্বারা নহে, শুধু সমাজের প্রতি অযথা গালি বর্ষণ দ্বারা নহে, শুধু বোকা সাজাইয়া নহে,শুধু কুশিক্ষার ফলে নহে, শুধু সুশিক্ষার অভাবে নহে, ভীষণ অত্যাচার দ্বারা, জোর করিয়া, মার-পিট করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া, অস্ত্রের ভয় দর্শাইয়া, প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখাইয়া পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে, ধর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে, দেশত্যাগী করা হইয়াছে, বনবাসী করা হইয়াছে। কি ভয়াঙ্কর দিন !

সত্য বটে, ইংরেজ রাজত্বে অত্যাচার হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মব্যবসায়ী মিসনারীগণ হিন্দুদিগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যত রকম উপায় হইতে পারে, তৎসমস্তই অবলম্বন করিয়াছে। এই বিষয়ে তাহারা বড়ই ফন্দি-বাজ। তাহাদের অবলম্বিত ফন্দিগুলির মধ্যে একটিই প্রধান এবং উল্লেখ যোগ্য। তাহারা সর্ব্বদাই বুঝাইয়াছে "এ দেশ ঘোরতর অন্ধকারে পতিত রহিয়াছে, এ দেশী লোক নিতান্ত বোকা কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত, এ দেশের শাস্ত্রগ্রন্থাদি সমস্তই ভ্রান্তি-পূর্ণ। এদেশে বিজ্ঞান দর্শন জ্যোতিষ গণিত প্রভৃতি কিছুই ছিল না। এই সব বিষয় শিখিতে হইলে, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তাহাদের সহিত আলোকে যাওয়া কর্ত্তব্য"। তাহারা এদেশীয় মনুষ্যগণকে বেশ বুঝাইয়া ছিল যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাহইলে মুক্তি একবারে হাতে হাতে আসিয়া পড়িবে। কার্য্যতঃও তাহাই ঘটিয়াছে,কত অসংখ্য নরনারী সনাতন ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কষ্টকর। গ্রামকে গ্রাম, পল্লীকে পল্লী, সমাজকে সমাজ, পরিবারকে পরিবার, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একবারে "আঁলোকে" চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ আলোর অন্বেষণে যাইয়া কেবল অন্ধকার দেখিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে,

আর যাহারা চক্ষুহীন অন্ধবৎ তাঁহারা আলোর আশাতেই রহিয়া গেছে—অন্ধকার তো তাহাদের চিরকালই।

এই প্রকারে হিন্দু সমাজের বহু সংখ্যক লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ধর্ম্মচ্যুত এবং সমাজচ্যুত হিন্দুগণের দ্বারা কত না জাতীয় পুষ্টি সাধিত হইত।

সুখের কথা এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন লোকে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে হিন্দুর ঘরে থাকিয়া যেমন আলো দেখা যাইতে পারে, তেমন আর কোথাও গেলে দেখা যায় না। ওদিকে "কুসংস্কারের" কল্পিত পর্দ্দাটাও কাটিয়া গিয়াছে। যাহা হউক এখন বৎসরে ২।১টা লোক ধর্ম্মচ্যুত হয় কি না সন্দেহ। ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে—ধর্ম্মের কাজ ধর্ম্মই করে।

এই ধর্ম্ম বিপ্লবের কালে এ দেশী লোক কতকটা অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছে। ধর্ম্মচ্যুত লোকদিগকে রক্ষা করিতে অনেক সময়ই চেষ্টা করা হয় নাই। তখন বহিষ্কার নীতিটাই সমাজে খুব প্রবল ছিল। বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে সমাজে নেওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সামাজিক নিয়মের প্রতিই তখন বিশেষ লক্ষ রাখা হইত। তখন মাতাপিতা পুত্রস্নেহে জলাঞ্জলী দিয়াছেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন, বন্ধু বান্ধব সহৃদয়তা বিসর্জ্জন করিয়াছেন !! ইহাকে ধর্ম্মের অনুরাগ বলিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিব, না, সামাজিক নিয়ম বলিয়া কিঞ্চিৎ নিন্দা করিব তাহা ঠিক করিতে পারি না। বাস্তবিক এখন আমরা যেমন সহজে সমালোচনা করিতেছি তখন কর্ত্তব্য ঠিক করা বোধ হয় তত সহজ ছিল না। সেই বিপ্লবের সময় মায়াবন্ধন-চ্ছেদ না করিলে, নিয়মের প্রতি, আচার ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে মূর্খতাজ্ঞাপক "আলো অন্ধকারের" অনিশ্চয়তাকালে, কে

জানিত, হিন্দুর নাম যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একবারে চলিয়া না যাইত ? বাস্তবিক বিপ্লবকালে নিয়মের কঠোরতাই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রধান উপায়।

উপরে আমরা যে অকর্ম্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা সর্ব্বথা ঠিক নহে। সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার জন্য, ধর্ম্মোদ্দেশে অনেক মহাত্মাই প্রাণপন চেষ্টা করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভগবদবতার শ্রীচৈতন্য দেব বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশ্ব প্রেমিকত্ব ভাবে দেশকে উন্মত্ত করিয়া ধর্ম্ম ঠিক্ রাখেন। তৎকালে তিনি অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুর সংখ্যা কত যে হ্রাস হইত তাহা কে বলিবে ? ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কিনা করিয়াছেন ? তৎকালে তিনি জন্মগ্রহণ না করিলে দেশের অবস্থা যে আরও কত ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিত তাহা কে ভাবিয়া দেখে ? হিন্দু ধর্ম্ম ইঁহার নিকট যথেষ্ট ঋণী।

গতস্য শোচনা নাস্তি। যাহা হওয়ার তাহা তো হইয়া গিয়াছে, সে সময় আর ফিরিয়া আসিবে না। এখন আলোচ্য বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য কি ? গত সময়ের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত নয় কি ? অতীতের সংবাদ জানি, শুনি, বুঝি বেশ, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই, বর্ত্তমানে নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছি, এইটা বোকামী নয় কি ? যাহারা ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে, যাহারা সমাজচ্যুত হইয়াছে তাহাদের জন্য আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই কি ? কল্পবৃক্ষের ন্যায় বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিশেষণবিগর্হিত হিন্দুধর্ম্ম এ সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেয় নাই কি ? কোন পথ করিয়া যায় নাই কি ? আমরা না জানিতে পারি, আমরা অজ্ঞ হইতে পারি কিন্তু অনুসন্ধান করিতে কোনও আপত্তির কারণ নাই।

আমাদের বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্য ধর্ম্মচ্যুত এবং সমাজচ্যুত ব্যক্তিদিগকে যথাস্থানে নেওয়া যাইতে পারে কিনা? শাস্ত্রে এ প্রকার ব্যবস্থা আছে কিনা? আমাদের এই কথাটা অনেকের নিকটই নূতন এবং আজকবি বলিয়া বোধ হইবে; তাহা হওয়ারও কথা; অচিন্তিতপূর্ব্ব বিষয়ে ঐ প্রকার হইয়াই থাকে। সম্প্রতি বিদেশ যাত্রীদিগকে সমাজে নেওয়া সম্বন্ধেই দেশে বেশ একটু গণ্ডগোল চলিতেছে। প্রথম অবস্থায় ইহা নিয়া দলাদলি লাফালাফি কম হয় নাই। এইক্ষণ সে স্রোতে মন্দা পড়িয়াছে। সুখের কথা বটে। বিদেশাগত ব্যক্তি দগকে সমাজে নেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা কালেই আমরা শুনিয়াছি তৎসম্বন্ধে নাকি কোন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নাই। অগত্যা কোথাও বা "বিদুষং পরামর্শঃ" মতে, কোথাও বা বিদ্যাশিক্ষার প্রতিপ্রসব দর্শাইয়া বিদেশাগত জনগণপ্রতি করুণা প্রকাশ করা হইয়াছে। এবমস্তু, যেন কেন প্রকারেণ কার্য্যসিদ্ধিবিধীয়তে; কাজ হইলেই হইল। কিন্তু স্পষ্টতঃ শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করা অপেক্ষা, শাস্ত্রকে অবমানিত করা অপেক্ষা, অকপট মনে শাস্ত্র আলোচনা করা সঙ্গত নয় কি?

বর্ত্তমান সময় আমাদের বক্তব্য শুধু বিদেশাগত ব্যক্তিদিগকে নিয়া নহে। আমরা মাত্রাটা কিছু বাড়াইয়া ফেলিয়াছি। যাহারা হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে আমাদের বক্তব্য তাহাদিগকে নিয়াই। বিস্ময়বিমূঢ় ভীতচিত ভাবে কথাটা মুখ ফুটিয়া না বলিয়া পারিলাম না "ইহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিতে কোন বিধি আছে কি? সমাজে লোক সংখ্যা কমিয়া যাওয়ার ইহা যে একটা প্রধান কারণ। ধর্ম্মচ্যুতির বা সমাজচ্যুতির ব্যারামে অনেক লোককে যে ক্ষয় করিয়াছে। আর এক কথা, হিন্দুধর্ম্মের উপরেই যত উৎপাত অন্য কোন সমাজ এই ভাবে হ্রাস পায় নাই; পাইলেও অতি সামান্য

মাত্রায় যাহা উল্লেখের যোগ্য নহে। কিন্তু হিন্দু সমাজের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। বিধর্ম্মীদিগের যত আক্রমণ অত্যাচার কেবল হিন্দুধর্ম্মেরই উপরে। দুষ্ট চোর শিষ্ট লোকের বাড়ীতেই প্রবেশ করে কারণ সেখানেই তাহার বিশেষ সুবিধা।

বিধর্ম্মিগণের আর একটা বেশ সুবিধা আছে। তাহারা জানে, আমরাও জানিয়া আসিয়াছি, শুনিয়া আসিতেছি, দুঃখের বিষয় দেখিয়া আসিতে পারি নাই,—যে হিন্দুরা ধর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিকে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। যে একবার বাহির হইয়া যায় সে। "আজও গেছে কালও গেছে।" হিন্দুদিগের এই নিয়মটা বিধর্ম্মীদিগকে বেশ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। তাহারা একবার যদি একজনকে হিন্দু সমাজের বাহিরে নিতে পারিয়াছে তবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আর পাহাড়াদারী করিতে হয় নাই। হিন্দুর বহিষ্করণ নীতিই বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদের পাহাড়াদাড়ীর কার্য্য করিয়াছে, এখনও করিতেছে। বিধর্ম্মীদিগকে এই প্রকার সুযোগ দেওয়াটা ঠিক হইয়াছে কি? এখনই বা তাহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া হইতেছে কেন?

অনেকেই না বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্ম ত্যাগ করে, অনেকেই প্রলোভনের আপাতমধুর রস আস্বাদন করিয়া ধর্ম্মচ্যুত হয়, অনেকেই দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছায় ধর্ম্ম ত্যাগ করে, কিন্তু যখন তাহারা বুঝিতে পারে, যখন তাহারা আত্মকৃত দোষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, যখন কৃতকার্য্যের দরুণ তাহাদের মনে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন, জ্ঞানের বিকাশ কালে, অনুতাপের বৃশ্চিক দংশনে দেহপ্রাণ জর্জ্জরিত হইয়া স্বধর্ম্মে ফিরিয়া আসিতে একান্ত ইচ্ছুক হয়। ধর্ম্মোন্মুখিনী সেই প্রবলা বাসনাকে পুর্ণ করা কর্ত্তব্য নহে কি? অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত নয় কি? লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত অধিকতর ফলপ্রদ নহে কি?

ইহা আত্মশুদ্ধির প্রধান এবং প্রথম উপকরণ নয় কি ?, অনুতাপবিহীন হৃদয়ে লোক দেখান প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিশেষ কোণ ফল লাভ আছে কি ? শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন ?

যাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের জন্য প্রবলা বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠে তাহাদিগকে সমাজে নিতে আপত্তির কারণ কি ? বরং এপ্রকার ধর্ম্মপ্রাণ লোককে গ্রহণ না করিলে আরও অধিকতর অনিষ্ট সংঘটিত হয়; সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল আসিয়া উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে কালাপাহাড়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহার নাম এদেশে অনেকেই জানে, আবালবৃদ্ধবণিতা সকলের মুখেই কালাপাহাড়ের ভীতিব্যঞ্জক নাম শুনা যায়; তাহার জীবনীও হয়ত অনেকেই জানেন; তবু আবশ্যক বোধে এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিলাম।

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়, সে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত থান্দা থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে তাহার জন্ম হয়। কালাচাঁদ বাঙ্গলা ও পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিল, সে খুব বলবান এবং অস্ত্রচালনে ও অশ্বারোহনে বিশেষ পটু ছিল। বিবাহিত হওয়ার দুই বৎসর পরে গৌড় সম্রাটের অধীনে সে ফৌজদারের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই সময়ে সে সম্রাট কন্যার কুনজরে বা "সুনজরে" পতিত হয়; সম্রাট কন্যা তাহাকে পতিত্বে বরণ করিল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে কালাচাঁদকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তখনও সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই। সে সম্রাট কন্যাকে পরিত্যাগ করতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। ধর্ম্মের প্রতি তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। অত্যাচার অবিচার বহির্দ্দেশের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে সত্য, কিন্তু মনস্বীর মনের কোন প্রকার বিপর্য্যয় করিতে পারে না।

বরঞ্চ, বাক্‌রুদ্ধ ব্যক্তির মন যেমন ক্রমশঃই ভাবস্ফীত হইতে থাকে অত্যাচারে মনস্বীর অবস্থাও তাহাই করে। ধর্ম্মের টান কি তেজিয়ান! জাতিচ্যুত কালাচাঁদ রাজার প্রদত্ত ভোগৈশ্বর্য্যের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজে উঠিতে সচেষ্ট হইল। সে স্বজাতির নিকট কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান চাহিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুড়িল; কিন্তু সর্ব্বৈব বৃথা: সে ব্যবস্থা পাইল না, সমাজে উঠিতে পারিল না; বঙ্গদেশে নৈরাশ্যজ্ঞাপক উত্তরেই তাহাকে আপ্যায়িত হইতে হইল। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেহই তাহার বিনীত প্রার্থনায় কর্ণ-পাত করিল না। কালাচাঁদ তখনও দৃঢ়, তখনও অবিচলিত চিত্ত; ধর্ম্মের তাড়নায় অবশেষে সে পুরীধাম যাত্রা করিল; বুকভরা আশা যে, সেখানে গেলে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। ৺জগন্নাথ দেবের নিকট অনাহার অনিদ্রায় কালাচাঁদ সাত দিন অতিবাহিত করিল, কিন্তু কেহই তাহার প্রতি সদয় হইল না, অধিকন্তু পাণ্ডাগণ তাহাকে অযথা তিরস্কার ও গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন কালাচাঁদ নিরাশ হইল; এজন্মের মত তাহাকে ধর্ম্মের মায়া, সমাজের মায়া, জাতির মায়া, দেশের মায়া, বন্ধুবান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্বের মায়া পরিত্যাগ করিতে হইল। যখন সে নিশ্চয় জানিল যে ধর্ম্ম রক্ষকদিগের সহিত বন্ধু ব্যবহারে তাহার মুক্তি হইবে না, তখন সে ধর্ম্মের সহিত শত্রুতা করিতে মনস্থ করিল; হিরণ্যকশিপু কংশের ন্যায় ধর্ম্ম দ্বেষী হইয়া সে মুক্তিলাভ করিতে কৃতসংকল্প হইল।

ধর্ম্মের ইঙ্গিতে, জগন্নাথ দেবের আদেশে প্রার্থিত বরের ফলস্বরূপে কালা পাহাড় শত্রুভাব অবলম্বন করিল। দীনহীনের সকরুণ প্রার্থনা ক্ষমতা সত্ত্বে পূর্ণ না হইলে যে কি ফল দাঁড়ায়, ন্যায় বিচারের অভাবে যে অন্যায়ের সৃষ্টি হয়, ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানিতে যে কি দুর্দ্দশা ঘটে, "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" না বুঝিতে পারিলে ধর্ম্মোপদেষ্টার বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞের যে কি

দশা ঘটে, পতিতপাবন নাম নিরর্থক ব্যবহৃত হইলে যে কি অনর্থ উৎপন্ন হয়, ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া সামাজিক নিয়মে আশক্তির যে বিষময় ফল, তৎসমস্তই কালাপাহাড়ের চরিত্রচিত্রে যুগপৎদৃষ্ট হয়। ধর্ম্মের অবমান হইলে ধর্ম্ম সেখানে থাকিবে কেন? তাই ধর্ম্মেরই আদেশে কালাপাহাড় ধর্ম্ম ধ্বজা সকল বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল; পুরীধাম হইতে আরম্ভ করিয়া কামাখ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের কত দেবালয়, কত দেবমন্দির কালাপাহাড়ের কঠোর হস্তে ধূলিস্মাৎ হইল। ধর্ম্মের জন্য উন্মত্তপ্রাণ এখন ভয়ঙ্কর ধর্ম্মদ্বেষী হইল। লোক শিক্ষার্থ ভগবানের ইহাও এক প্রকার ইঙ্গিত বা ইচ্ছা। "যোগ্য পাত্রে অনাদর করিলে বিস্তর" এরূপ ঘটিবে না কেন?

নুতন পাঠকদিগের অবগতির জন্য কালাপাহাড়ের বিবরণ আরও একটু লিখিতে হইল। ভারতে এমন স্থান নাই যে খানে কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। কালাপাহাড় জোর করিয়া পাণ্ডা এবং অপরাপর বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। এক মাত্র কালাপাহাড় হিন্দুর যে পরিমান অনিষ্ট করিয়াছে বোধ হয় সমস্ত মুসলমানের কৃত অত্যাচার তাহার সমান হইবে না। কালাপাহাড় ৺কাশী ধামের প্রতিও কম অত্যাচার করে নাই। কাশীর বহু সংখ্যক মন্দিরই তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল। এই সময়ে কালাপাহাড়ের অনুচরবর্গ কাশী-বাসীনী তাহার এক মাতুলানীর উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। মাতুলানী ঘৃণায় দুঃখে ক্রোধে রোদন করিতে করিতে ভাগিনেয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করে এবং তাহারই সাক্ষাতে আত্মহত্যা করে। কালাপাহাড় স্বচক্ষে এই শোচনীয় ঘটনা দর্শন করিয়া তৎক্ষনাৎ অত্যাচার বন্ধ করে; এবং সেই

রাত্রিতেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়া যায় আর কেহই তাহার কোন অনুসন্ধান পায় নাই। ভীষণ অত্যাচারী ছিল বলিয়াই "কালাচাঁদ রায় কালাপাহাড়" নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

যাহা হউক যোগ্যব্যক্তিকে সমাজে না নেওয়ার ফল যে কি হয় তাহা দেখাইবার জন্যই কালাপাহাড়ের অবতারনা। সমাজে নেওয়া, না নেওয়া সামাজিক লোকদিগের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, একত্র খাওয়া বসা করা না করা কুটুম্বগণের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের বান্ধবতা বা শত্রুতা,কিন্তু পতিতপাবনের অজস্র দয়াস্রোতে অসার যুক্তি তর্কের বালুকা বন্ধন টিকে কোথায়? যবন হরিদাসের কি হইল? চৈতন্যদেব তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি? না, তাহাকে গ্রহণ করাতে চৈতন্যদেবের দেবত্বের হ্রাস হইয়াছে? চৈতন্যের সমাজ বন্ধ করিবার জন্য কত ধুরন্ধর জলের রজ্জু দৃঢ়রূপে প্রস্তুত করিয়াছিল, মুহুর্ত্তপরে সব শূণ্য, সব শূণ্য, ফলে কেবল লজ্জার কটু আম মাখা।

সুধু হরিদাস কেন? চৈতন্য অবতারে এই প্রকার অনেক যবনই মুক্ত হইয়াছে। জাত্যন্তরিত বহুসংখ্যক লোকই হিন্দু ধর্ম্মে পুনরানীত হইয়াছিল। এই প্রকার ঘটনার অভাব নাই; রামরূপে বিভীষণ,কৃষ্ণরূপে কুব্জী, ব্যাসরূপে রত্নাকর, নিতান্ত আধুনিক বিবেকানন্দ রূপে শ্বেতকায় নরনারীগণ, পতিত উদ্ধারের দৃষ্টান্ত নহে কি? আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে আর কত দৃষ্টান্ত দেখাইব?

ধর্ম্মভাবের গতিরোধ করিতে যাওয়া মূর্খতা; পুণ্যের পরিবর্ত্তে তাহাতে পাপই সম্ভবে। বিরুদ্ধ চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য নহে, কৃতকার্য্যতা অসম্ভব। প্রহ্লাদের হরিনাম ছাড়াইতে হিরন্যকশিপুর অসীম ক্ষমতা সমর্থ হইয়াছিল কি? তাঁহার দর্প একবারে খর্ব্ব। সুরথ রাজাই বরং ভাল কাজ করিয়াছিলেন; পুত্র মুখে দুর্গানাম শুনিয়া এবং শিখিয়া সব

বিপদ কাটাইয়া দিলেন; "মধুর দুর্গানামের" আস্বাদনে "বিষম বিপদে" উত্তীর্ণ হইলেন। ধর্ম্মের মহিমা এমনই বটে।

এত কথাতো লিখিলাম কিন্তু বলি কাহাকে? জিজ্ঞাসা করি কাহাকে? উত্তর দিবে কে? সদয়ভাবে মনের আশা কে মিটাইবে? পুস্তকাকারে যখন লিখিয়াছি তখনই জিজ্ঞাসার কাজ হইয়া গিয়াছে; কলিকাতার সহরে যেমন অনির্দ্দিষ্ট জনগণকে বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়, তদনুসারে যিনিই দোকানে আসেন তাহারই আবশ্যক আছে বলিয়া প্রমাণিত হয়, ঠিক সেই প্রকার শিক্ষিত সমাজের বিস্তৃত সহরে লেখার বিজ্ঞাপন বিলি করিলাম, আবশ্যক বোধে যিনিই সারা দিবেন বুঝিতে হইবে তাঁহারই দরকার আছে। কিন্তু তবু মনে মানিতেছে না; "মন্দার বাজারে" পাছে যদি খরিদদার নাই জুটে—তাই বিশেষ অনুরোধ, বিশেষ বিজ্ঞাপন। যথাবিহিত নমস্কার পূর্ব্বক—ব্রাহ্মণ সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শাস্ত্রের আলোচক, সমাজের কর্ত্তা, ভূদেব ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাদের শিক্ষা দীক্ষার উপর সমগ্র হিন্দু সমাজের মঙ্গলামঙ্গল, উন্নত্যবনতি নির্ভর করিতেছে সেই ব্রাহ্মণ সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রা-লোচক, শাস্ত্রের জটিল ভাবোদ্ধারক পণ্ডিত সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাদের সামান্য ভ্রান্তিতে সমাজের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সম্ভাবনা সেই পণ্ডিত সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাদের দেশকাল পাত্রানুযায়ী ব্যবস্থার প্রতি সমগ্র হিন্দু সমাজের আস্থা আছে সেই পণ্ডিত সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমরা নবদ্বীপ সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, পূর্ব্ব-বঙ্গের সারস্বত সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কলিকাতার ব্রাহ্মণ সভাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমন কি আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষয়ে তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা? শাস্ত্রীয় যুক্তি ব্যবস্থা আছে কিনা? এক

কথায় জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকে সমাজে নেওয়ার কোন উপায় তাঁহারা করিতে পারেন কিনা? আমাদের বিনীত প্রার্থনা, ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বেষ মান অভিমানেরদিগে না চাহিয়া সমাজের মঙ্গলার্থ, দেশের কল্যানার্থ, ধর্ম্মের শুভার্থ, তাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন কিনা? আমাদের অবোধ মনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য হাঁ, না একটা উত্তরের আশায় বসিয়া রহিলাম।

শুধু এই নহে; শুধু ব্রাহ্মণ সমাজকে নহে; আমরা অন্যান্য সমাজকেও এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম। আমরা জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম, কারণ মুখ আমাদের নিজ স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারে, ইহাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই—অন্ততঃ সামাজিক বিষয়ে। আর অপর সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কারণ তাহারা হিন্দু সমাজের অন্তর্গত, সমাজের স্বার্থের সহিত তাহাদের স্বার্থও বিজড়িত; লোকক্ষয়ে, ধম্মনাশে, অবস্থা বিপর্য্যয়ে সকলেই ক্ষুণ্নমন, সকলেই ভীতচিত, সকলেই চিন্তিতহৃদয়। তাই সকাতরে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র যে কোন হিন্দু সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি জাতিভ্রষ্ট লোকদিগকে সমাজে নেওয়া সম্বন্ধে তাহাদের মতামত কি? হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার্থ মতামত প্রকাশ করিতে তাঁহারও সক্ষম, শুধু স্মরণার্থই ইহা উল্লেখ করিলাম। যুক্তি সঙ্গত কথা বক্তার জাতিবর্ণ বিচার না করিয়াও গ্রাহ্য হইতে পারে; তাহা হইয়াও থাকে। দেবার্চ্চনার জন্য ভগবদ্ভক্ত সকল পুষ্পই আহরণ করে, তাহার জন্মস্থান বাগিচাই হউক বা জঙ্গলাই হউক।

আর এক কথা, কাঁদি-কাহার জন্য? বলি কাহার জন্য? এইটাও বুঝা দরকার। যাহাদের জন্য বলা হইতেছে তাহাদেরও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা উচিত। ধর্ম্মের জন্য লালাইত হওয়া চাই, মনের গতি ধর্ম্মোম্মুখিনী

হওয়া আবশ্যক। গাছের ফল সময়ানুসারে ভূপতিত হয় সত্য, কিন্তু তবু গ্রাহককে চেষ্টা করিতে হয়, কুড়াইয়া নিতে হয়, ফল কখনও মুখে আসিয়া পতিত হয় না। তাই বলিতেছি যাহারা জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহারা দেশীখেশী বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা কৃতকার্য্যের ফলাফল আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছে, যাহারা অনুতাপের নিদারুণ যাতনায় অবিরাম স্রোতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, যাহারা জানিয়াছে ধর্ম্ম জিনিসটা কি প্রকার, যাহারা বুঝিয়াছে ধর্ম্মের উৎপত্তি কোথায়, যাহারা জানিয়াছে আসল এবং নকল জিনিসে কত পার্থক্য, যাহারা ব্যবসায়ীর কুটনীতি বুঝিয়াছে, যাহারা আপন পর চিনিয়াছে যাহারা আপন জিনিষ পরিত্যাগ করা অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহাদিগকে বলিতেছি, তাহাদিগের স্বার্থের জন্য বলিতেছি, দেশের হিতের জন্য বলিতেছি, সমাজের হিতের জন্য বলিতেছি, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বলিতেছি, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে,—সত্যের জন্য—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

সত্য এক ভিন্ন দুই হয় না। মিথ্যার চাকচিক্যে বিজড়িত সত্যের ভগ্নাংশকে অধিকতর দেদীপ্যমান বলিয়া উপলব্ধি করা জ্ঞান-নেত্রের দোষ বই গুণ নহে। মানুষের দৃষ্টিহীনতার ইহাই প্রধান লক্ষণ। জ্ঞানের যতই বিকাশ হইবে সত্যও ততই প্রতিভাত হইতে থাকিবে; চরমকালে যখন বিশুদ্ধ সত্যকে অনুভব করিতে পারিবে, যখন ঠিক্ সত্য জিনিষ বাছিয়া নিতে সমর্থ হইবে, তখনই দেখিবে, অসন্দিগ্ধহৃদয়ে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে দেখিবে, ভ্রান্ত নর! তুমি হিন্দুধর্ম্মের দ্বারে উপস্থিত, তখন বুঝিবে, তখন জানিবে, হিন্দু ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম। তাই আজ হিন্দু ধর্ম্মের গুণগান সভাঙ্গনে

প্রাণের তানে গাইতে আরম্ভ করিয়াছে; কেহ সুগায়কের ন্যায় স্বরকে সপ্তমে উঠাইয়াছে, কেহ শিক্ষানবিশের ন্যায় গুণ্ গুণ্ স্বরে নিজ মন প্রাণের সহিত তাল মান ঠিক করিতেছে, উচ্চ আওয়াজ ফুটিতে বেশী বিলম্ব নাই। তাই আজ এমেরিকায় হিন্দুর ধর্ম্ম মন্দির গগণ ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতেছে; তাই ইউরোপ মহাদেশে হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই কত সাহেব মেম অরসিকতা জ্ঞাপক হিবিজিবি পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রতা লাভের উপকরণ স্বরূপ গৈরিক বসন পরিধান করতঃ বেদ বেদান্তের আলোচনায় অনন্যকর্ম্মা হইয়াছে। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এও কি সত্য নয় যাহা ইতিহাসের অনধিগম্য সময় হইতে আত্ম প্রাধান্যগুণে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, এও কি সত্য নয় যাহা সভ্য জগতের কুটনীতি প্রবল গভীর গবেষণার তীব্র সমালোচনাতেও অভ্রান্ত বলিয়া প্রমানিত হইয়াছে, এও কি সত্য নয় যাহা সমগ্র ধর্ম্ম জগতের প্রকাশ মান সূর্য্য, এও কি সত্য নয় যাহা হইতে অপরাপর ভগ্নাংশের উৎপত্তি হইয়াছে? এও কি সত্য নয় যে, ভারত এই গৌরবে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? এও কি সত্য নয় যে ভারত ভূমি সর্ব্ব ধর্ম্মের জননী, এও কি সত্য নয় যে ধর্ম্মই ভারত বাসীর এক মাত্র গৌরবস্থল, এও কি সত্য নয় যে জ্ঞানধর্ম্মে আজও ভারতবাসী জগতে অদ্বিতীয়? কিন্তু ভাই, তোমরা সে গৌরবে বঞ্চিত; নিজের দোষে নিজের গৌরব হারাইতেছ, যে জিনিষ তোমার নিজের তাহা তুচ্ছ করিয়া পরের জিনিসে আত্মতুষ্টি করিতেছ, ফলে কেবল পরের ক্রীড়াপুতুল সাজিয়া বোকা হইতেছ; "স্বাধীন চিন্তায়" মনোযোগ দিয়া দেখ দেখি।

পূর্ণের মধ্যেই অংশ থাকে; অংশের মধ্যে পূর্ণ থাকেনা, থাকিতে পারে

না। পূর্ণ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে অংশের জন্য কে লালায়িত হয়? পূর্ণ জিনিষটা ধরিতে পারিলে অংশের অভাব থাকে কি? হিন্দু ধর্ম্ম পূর্ণ জিনিষ, ইহাতে সব পাইবে, যেভাব চাও ইহাতে তাহাই আছে। ধর্ম্মকে কোন্ ভাবে চাও, সাকারে বা নিরাকারে, একে কিম্বা বহুতে, তেত্রিশ কোটী দেবদেবীতে বা একমেবাদ্বিতীয়মে, সজীবে বা নির্জীবে, ঘরে কিম্বা বাহিরে, দেশে কিম্বা বিদেশে, গ্রামে কিম্বা জঙ্গলে, বাড়ীতে কিম্বা পাহাড়ে, বাল্যে কিম্বা যৌবনে, কৈশোরে বা বার্দ্ধক্যে, যুগলে কিম্বা একাকী, খাইয়া কিম্বা না খাইয়া, আমিষ আহারে বা নিরামিশ আহারে, নিমিলিত নেত্রে বা উন্মিলিত নেত্রে, সজ্জিত কলেবরে বা উলঙ্গবেশে, আশক্তি রাখিয়া বা আশক্তি ছাড়িয়া, হাসিয়া কান্দিয়া নাচিয়া গাইয়া, কোন্ভাবে ধর্ম্মকে চাও; যে ভাবে চাও তাহাতেই মজা পাইবে। আরও মজা পাইবে "ভারতের আধ্যাত্মিক" ইতিহাস আলোচনা করিলে।

সংক্ষেপে সম্প্রতি এই মাত্রই বলিলাম। স্মরণার্থ আরও একটু বলিয়া রাখি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"। এই ধর্ম্মে যে যে ভাবে তাঁহাকে চায়, সে সে ভাবেই ভগবানকে পায়। তাই বলি ভাই; অগ্রসর হও, বৃথাভাবনায় ভীত হইও না। সময়ের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সাময়িক সঙ্কীর্ণতার আবরণ কাটিয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতের অঙ্কে শায়িতা ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, ঐ দেখ ভাই, জাগরিত হইতেছে। কেন তোমরা তাঁহার আরাধনায় পরান্মুখ হইবে? চেষ্টা কখনও বন্ধ্যা নহে। চেষ্টা কর অচিরে ফললাভ করিতে পারিবে। আমরা জানি অনেকে এ বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে, সাধের আশায় একবারে জলাঞ্জলী দিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু এখন সে ভাব নাই। স্থিরচিত্তে একমনে ভাবিলে ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ বাণী শুনিতে পাইবে, "সম্ভবামি যুগে যুগে"। তজ্জন্যই বলিতেছি তোমরাও ভাই চেষ্টা কর।

গত সময়ের নৈরাশ্য, কুব্যবহার, অকৃতকার্য্যতা, অকর্ম্মণ্যতার বিচার ব্যবস্থায় মাথা ঘামাইয়া বর্ত্তমান সময় বৃথা কর্ত্তন করিলে কি ফল হইবে? তাহা করিলে ভবিষ্যতেও "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে," পড়িয়া থাকিবে। ভবিষ্যতের কাজ কিছুই যে হইবে না। ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য এই মাত্রই বলি, আরকি বলিব?

আরও একটী বিষয় বলিতে হইল। হিন্দুর ঘর হইতে কতকগুলি লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এদেশের খাশিয়া, জন্তিয়া ভীল, নাগা, টিপরা প্রভৃতি কতকগুলি লোক এইক্ষণ ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে; তাহাদের প্রতি হিন্দুদিগের মাত্রও লক্ষ নাই। তাহারা হিন্দুর দেশের লোক, হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই আসিতেছিল। ইহাদের যে হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অপর কোন ধর্ম্ম ছিল এমন প্রমান কিছু মাত্র নাই। ইহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস, ইহাদের দেবদ্বিজে গাঢ়ভক্তি, ইহাদের ঐকান্তিকতা ইহাদের স্থিরচিত্ততা দর্শনে অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোককেও লজ্জা পাইতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? নিবিড় কাননে প্রস্ফুটিত পুষ্প যেমন মানবের অজ্ঞাতসারে থাকিয়াই শুকাইয়া যায়, কখনও দেবতার অর্চ্চনায় ব্যবহৃত হয় না, ইহাদের দশাও তাই। ইহারা উন্নত সমাজের অপরিজ্ঞাত কেহই ইহাদের খোজখবর নেয় না; ইহাদের উপদেষ্টা নাই, ইহাদের শিক্ষাগুরু নাই, ইহাদের দীক্ষাগুরু নাই, অধিকতর দুঃখের কথা, ইহাদিগকে "আপন জন" বলিবার লোক কেহ নাই। ফলে ইহারা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে: তাই যে যখন যে ভাবে তাহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করে, অজ্ঞানতানিবন্ধন হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া ইহারা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ করা অস্বাভাবিক নহে। তাই ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন ধর্ম্মত্যাগ করিতেছে। এখন হইতে প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নয় কি? কিন্তু তাহা হইবে না,

আমাদের যত পরামর্শ ঘরে বসিয়া, যত বুদ্ধিক্ষয় তেজগর্ভ বক্তৃতা ঝাড়িয়া কাজের বেলায় সব কাষ্ঠপুত্তলী ; এইটা আমাদের সংক্রামক রোগ নহে কি ? পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা নেওয়া উচিত নয় কি ? আমরা সময়ানুযায়ী কাজ না করিয়া, "যেন দেখি, দেখি, দেখি না," শেষে নিস্পন্দকলেবরে বিস্ময়ব্যঞ্জক নেত্রে কিঞ্চিৎ বদনব্যাদন করতঃ "হাঁ কি হইল" বলিয়া সমস্ত সহানুভূতি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করি। আমরা বেশ বাহাদুর !

সে যাহা হউক আর এক ভাবে একটু বলিতে হয়। উল্লিখিত জাতিগুলি অনার্য্য সত্য, কিন্তু তাহাদের কি একটা ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক করে না ? অনার্য্যদিগের জন্য, আর্য্যগণের কি কোন কর্ত্তব্য নাই ? আমরা জানি, অনেক প্রমান আছে, বহু সংখ্যক অনার্য্য যে ভাবেই হউক, আর্য্যদল ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। উৎপন্ন শস্য প্রথমতঃই আহারের উপযুক্ত হয় না ; চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া তাহাকে খাদ্য অবস্থায় পরিণত করিতে হয়, তবে তো খাইবে, তবে তো দেহ পুষ্ট হইবে ? দেহরক্ষার উপযোগী করিতে আপত্তি কি ? খাও বা না খাও, তৈয়ার করিয়া রাখ, সময়ে উপকারে আসিবে ; ভাল কথা নয় কি ?

একটা বাজে কথা বলিতে হইল, ধর্ম্মের রাজ্য ক্ষুদ্র হইল কেন ? সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হিন্দু ধর্ম্মের বিস্তৃত রাজ্য এত ক্ষুদ্র, এত সঙ্কীর্ণ হইল কেন ? কাহার দোষ ? এক সময়ে হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞাত জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল ; এশিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, কোন্ মহাদেশে নয়, কোন্ দেশে নয় ? হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অপর ধর্ম্মই যে ছিল না। আজ তাহার এ দুর্দ্দশা কেন ? একদিনে হয় নাই, বহু শতাব্দি হইতে এই দুর্দ্দশার ক্রমোন্নতি হইয়া আসিতেছে। কি কারণে ? আজ সুযোগ বোধে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যাহার উপর যে কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকে তাহার দোষগুণের জন্য

সেই সম্পূর্ণ দায়ী। কর্ত্তার দোষে কার্য্য নষ্ট হয়, আর গুণে কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, সত্য নয় কি ? আমি আমার সংসারের কর্ত্তা ; সংসারের উন্নতি অবনতির জন্য আমি দায়ী হইব না কি ? লোকে আমাকে বলিবে নাকি ? লোকে বলুক বা নাই বলুক, দায়িত্বজ্ঞান থাকিলে, বিবেক বুদ্ধি থাকিলে আমি নিজেই বুঝিব যে আমার দোষে বা গুণে সংসারের অমঙ্গল বা মঙ্গল ঘটিতেছে। আমি মনুষ্যত্ব বিহীন হইলে অন্যের মতামত অপেক্ষা করিব কিন্তু আমার বুদ্ধি বিবেচনা থাকিলে অন্যের মতামত অপেক্ষা করাও যে লজ্জাজনক। সংসারে কর্ত্তব্য বোধ থাকা একান্ত দরকার। আমার ঘরে চাউল নাই ; চাউল আনিব কি না সে কথা কি পরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, এইটা কি উপহাসের কথা নহে ? বরং এই হইতে পারে যে চাউল আনিবার জন্য অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারি। পরের সাহায্য কার্য্য বিশেষে নিতান্ত দরকার।

যাহা হউক হিন্দুধর্ম্মের অবনতির কারণ ঠিক করিতে গেলে প্রথমতঃ তাহার কর্ত্তা চিনিয়া নিতে হইবে। এক্ষেত্রে কর্ত্তা খুজিতে কিছুমাত্র আয়াস বা কষ্ট নাই। ব্রাহ্মণ যে এ ক্ষেত্রের কর্ত্তা তাহা কাহারও অবিদিত নাই, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কর্ত্তা নিজেও বোধ হয় জানেন যে কার্য্য করেন বা করান বলিয়া তিনিই কর্ত্তা। এ স্থলে দুইটী তর্কের কথা উপস্থিত হইতে পারে (১) শুধু ব্রাহ্মণই কি হিন্দু ধর্ম্মের কর্ত্তা, (২) ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে অর্দ্ধ পক্ক অন্নের ন্যায়, বর্ত্তমান কালের অসার উক্তি। (১) শুধু ব্রাহ্মণই যে হিন্দু ধর্ম্মের বা হিন্দু সমাজের কর্ত্তা আমরা তাহা মনে করি না। পূর্ব্বাপর ঘটনাবলীর আলোচনা করিলে দেখা যায় সকলেই ইহার কর্ত্তা, কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা যাহার ছিল সেই কর্ত্তা হইয়াছে ; তবে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় "বাবুর বাজারে"

হট্টগোল যেন না ঘটে তাই কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়ম করা হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ সেই সমস্ত নিয়ম চিরকালই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা করিতে যে সমর্থ হইয়াছিল, দূরদর্শী ঋষিগণের বিধিবদ্ধ নিয়মই তাহার দেহরক্ষার এক মাত্র অস্ত্র। সেই নিয়ম অনুসারে অন্ততঃ ধর্ম্মরক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে এবং ধর্ম্মের উন্নতি কল্পে ব্রাহ্মণকেই সর্ব্বদা যত্নশীল হইতে হইবে। ব্রাহ্মণের প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য ধর্ম্মোন্নতি।

(২) সমাজের কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ব্রাহ্মণ সমাজের উপর বাক্যবর্ষণ হইয়া থাকে। সেই বাক্যবর্ষণ দ্বারা যদি কোন কাজ হইত তবে এস্থলে আমাদের বলিবার কিছুই ছিলনা। অর্দ্ধপক্ক বা অপক্ক অন্ন ভোজনে যেমন আহারের তৃপ্তি কিছুই হয় না পরন্তু কেবল পেটে অসুখেরই সৃষ্টি করে, সেই প্রকার অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণের অসার উক্তি দ্বারা কাজ তো সম্পন্ন হয়ই না, বরং কার্য্যহানিরই সহায়তা করে। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বোধ হয় একথা স্বীকার করিবেন। বৃদ্ধকালে দন্তগুলি যখন স্থান চ্যুত বা চর্ব্বণে অক্ষম বা যন্ত্রনার কারণ হইয়া পড়ে, তখন দুই একজন লোকের মুখে শুনা যায় 'দাঁত না জন্মিলেই ভালছিল, যে কয়টা আছে তাহাও শীঘ্র পড়িয়া যাউক"। ইত্যাকার উক্তি পূর্ব্ব ঘটনার বিস্মৃতি হইতেই উৎপন্ন। স্মৃতির দোষে মানুষ মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু আমরা জানি প্রাচীন দন্ত বাঁধাইয়াও কাজ চালান যাইতে পারে।

যাহা হউক হিন্দু সমাজের উন্নতির কারণ সকল সম্প্রদায়ের সমবায় চেষ্টা বা শক্তি। তাহার অবনতির জন্যও ন্যূনাধিক সকলেই দায়ী। এই কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধ্য। তবে ব্রাহ্মণের উপর চোট্ চাপট্টা কিছু বেশী পড়িবে। শুধু দোষের কথাই যে বলিতেছি তাহা নহে, গুণের বেলায় ও বড় ভাগ ব্রাহ্মণেরই।

ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের কর্ত্তা ; তাই সমাজের দোষ গুণ, উন্নতি অবনতির জন্য ব্রাহ্মণকেই দায়ী হইতে হইবে। তাই বলিতেছি ব্রাহ্মণের দোষেই হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দুসমাজের অবনতি। পৃথিবী পরিব্যপ্ত হিন্দুধর্ম্মের সংকীর্ণতা শুধু ব্রাহ্মণের দোষেই ঘটিয়াছে ; তাহা না হইলে বেদব্যাস মনু প্রভৃতির উক্তি কি মিথ্যা ?

মনু বলিয়াছেন—

শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
বৃথাত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্র দ্রাবিতাঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ
পারদা, পহ্লবাশ্চীনা কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ।"

অর্থাৎ পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিত, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি সমূহ ব্রাহ্মণগণের অদর্শন হেতু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইয়াছে।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

শকা যবন কাম্বোজস্তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
বৃশত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ।
দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ পুলিন্দাশ্চাপ্যশীনরাঃ
কোলিসর্পা মাহিষকাস্তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
মেকলা দ্রাবিড়া নাটা পৌণ্ড্রাঃ কোন্বাশিরাস্তথা
শৌণ্ডিকা দরদা দর্ব্বাশ্চৌরা শবর বর্ব্বরা
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
বৃষশত্ব মনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানাম দর্শনাৎ।"

সব স্থলেই যে ব্রাহ্মণদিগের অদর্শন হেতু যত জাতিচ্যুতির ঘটা।

কলিন্দ, পুলিন্দ, উশীবর, কোল্লিসর্প, মাহিষক, মেকল, লণ্ট, কণ্ঠাশির শৌণ্ডিক, দধ্রু, চোর শবর, বর্ব্বর প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি সমূহ ব্রাহ্মণের দর্শন না পাওয়ায় ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। এই সমস্ত জাতির বর্ত্তমান নাম ধামের বর্ণনা করিয়া পূর্ব্বাপরের সমতা প্রদর্শন করা এ স্থলে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে হরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতেও নানা প্রকার জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু, কেহ বা অপরাপর জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কেহ বা নামান্তরিত অবস্থায় থাকিয়া ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছে।

যাহা হউক সে অতীত কালের কথা ছাড়িয়াদিলাম। কিন্তু এই যে বর্ত্তমান কালের খাশিয়া জৈন্তিয়া, নাগা, ভীল, সাওতাল, টিপরা প্রভৃতি জাতি আমাদের দেশে গ্রামে থাকিয়াই "ব্রাহ্মণনামদর্শনাৎ" হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, ভবিষ্যতের ইতিহাসে সে দোষও যে ব্রাহ্মণের উপরেই পড়িবে। এ সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের কোন কর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত নয় কি? কাহাকেই বা বলিব? আমরা শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারি কি? উক্ত ধর্ম্ম মণ্ডল এ বিষয়ে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আমাদের একান্ত বিশ্বাস। এ সব সম্বন্ধে আলোচনা করা হিন্দুদিগের পক্ষে অগৌরবের কথা বলিয়া আমরা মনে করি না, মর্য্যাদা হানিরও সম্ভাবনা দেখি না। যাহা হউক ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল এই বিষয়ে মনোযোগ দিলে বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মহামণ্ডলকে অতিরিক্ত কিছু বলা আমাদের পক্ষে বাচালতা বই আর কিছুই নহে।

আমাদের বিশ্বাস এই কার্য্যের জন্য একটী সমিতি গঠন করিলে বিশেষ ভাল হয়। ভগবানের কৃপায় এদেশে ত ভবঘুরের অভাব নাই। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া জীবন কাটাইলে, ঐহিক সুখ বিশেষ

না হইলেও, পারলৌকিক উপকার যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদিগের মাত্রও যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। যদ্যপি প্রচার কার্য্য খুব মৃদুমন্দভাবে চলিতেছে সত্য, তাহাও কেবল আমাদেরই ক্ষুদ্র গন্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ। যে জায়গায় ইহার খুব বেশী দরকার নাই, সে স্থলেই ইহার প্রচলনটা বেশী; তৈলাক্ত শিরে তৈল প্রক্ষেপের মত।

ধর্ম্ম প্রচারে ব্রাহ্মণেরই স্বার্থ বেশী; ভগবান শঙ্করাচার্য্য যদি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন পাত না করিতেন তবে ক্ষতিটা হইত কাহার? প্রথম নম্বরে ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষতিই তো পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্করের উপ্ত বৃক্ষ হইতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এখনও কি ফলাহরণ করিতেছেন না? শ্রীচৈতন্য দেব যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার কথাও কি তুল্যাংশে সত্য নহে? ইনিও তো সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির জন্যই জীবন পাত করিয়াছেন। সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ কি ইহাদের একটী পদরেণুর অনুসরণ করিতেও অক্ষম?

এস্থলে আরও একটী কথা না বলিয়া পরিলাম না, সত্যের অনুরোধে। আমাদের দেশে প্রচার কার্য্য চলিতেছে বেশ, কিন্তু তাহা যেঠিক সময়ানুযায়ী এবং কার্য্যের গুরুত্বানুরূপ হইতেছে আমরা তেমন বিশ্বাস করিতে পারিনা। অনেক স্থলে প্রাচীন নিয়ম পদ্ধতিগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে তাই অবলম্বিত পন্থাগুলি ঠিক কার্য্যক্ষম হইতেছে না। বরং স্থল বিশেষে উপহাসের কারণই হইতেছে। দশদিগ দেখিয়া শুনিয়া কাজ করা কর্ত্তব্য নয় কি?

——:০:——

পরিশিষ্ট।

ভ্রান্ত মতের উপর নির্ভর করাতে হিন্দুর সংখ্যা সম্বন্ধে যে তালিকা প্রদর্শন করিয়াছি তাহা ঠিক হয় নাই। এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব জানিতে হইলে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ" নামক অবশ্যপঠনীয় পুস্তক খানা অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

——:*:——

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্রই বাহির হইবে।

১। সামাজিক সমস্যা ২য় ভাগ ... (যন্ত্রস্থ)

২। বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ... ... „

লক্ষ্মীমণি চরিত।

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

"সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়" এই মহাবাক্যের জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ "লক্ষ্মীমণি"। লক্ষ্মী জনৈকা সামান্য দরিদ্র কন্যার প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা স্ত্রীলোক-দিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী। এই পুস্তকের আয় পতিতা কন্যাগণের সাহায্যার্থে ব্যায়িত হয়।

এই পুস্তক সম্বন্ধে অনেকগুলি সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি মাত্র সমালোচনা পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"লক্ষ্মীমণি চরিত পাঠ করিয়া আমরা স্থানে স্থানে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি, এবং পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি। বঙ্গদেশে এখনও যে এইরূপ রমণী রত্ন জন্মায় ইহা লক্ষ্মীমণি চরিত প্রকাশের পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না। সীতা, সাবিত্রীর উপাখ্যান হইতেও এই লক্ষ্মীমণি চরিত অতি আদরের জিনিষ। লক্ষ্মীমণি প্রকৃতই স্বয়ং লক্ষ্মী, বিপথগামিনী বঙ্গ ললনার শিক্ষার্থেই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা। লক্ষ্মীমণি চরিত জীবন্ত দৃষ্টান্ত, তাই রমণীর অশেষ হিতকারী। যিনি এই লক্ষ্মীমণি চরিত পড়েন নাই, তিনি এই সংসারের একটি উজ্জ্বল নির্ম্মল রত্ন দেখেন নাই এবং তাঁহার জীবন অসম্পূর্ণ। যিনি একবার লক্ষ্মীমণি- চরিত পড়িবেন, তিনিই বলিবেন "ইহা একখানি অমূল্য রত্ন।"